জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

তুর্কিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, চীন
কাতার ও বাংলাদেশের সফরনামা

হারানো ঐতিহ্যের দেশে

আমার দেখা পৃথিবী-৩
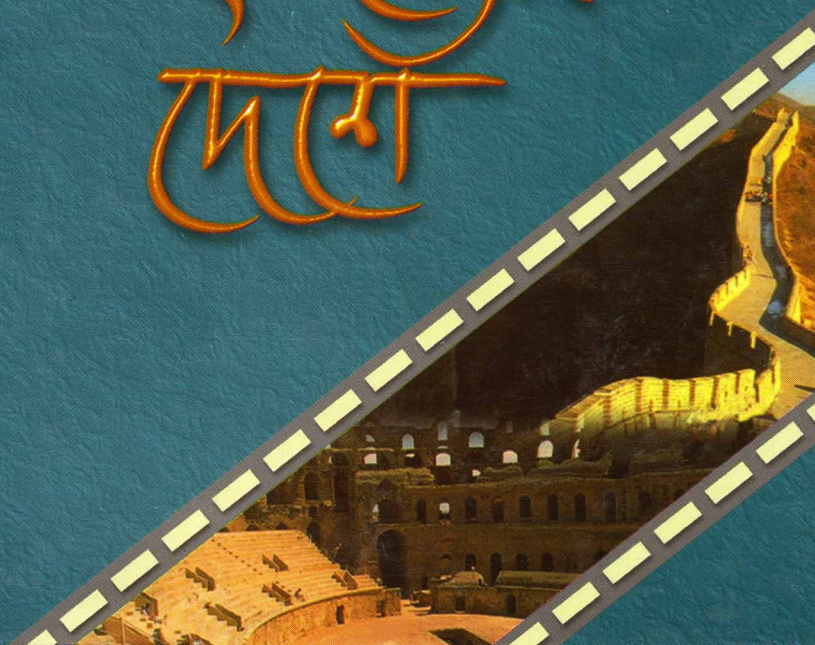
হারানো ঐতিহ্যের দেশে

[জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম)–এর তুর্কিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার ও চীনের ঐতিহাসিক সফরনামা]

মূল

জাস্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(দামাত বারাকাতুহুম)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

মুদাররিস ঃ টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা

ইমাম ও খতীব ঃ আলবাইতুল মা'মুর জামে মসজিদ

আহালিয়া, উত্তরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

হারানো ঐতিহ্যের দেশে

মূল ঃ জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
রবিঃ সানী ১৪২৪ হিজরী
জুন ২০০৩ ঈসায়ী

প্রথম মুদ্রণ ঃ
মুহাররম ১৪২৩ হিজরী
এপ্রিল ২০০২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতাজ
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭৩৯৫২৭৪

ISBN-984-8291-15-0

মূল্য ঃ নব্বই টাকা মাত্র

HARANO OAITIJJOR DESHE

By Justice Maulana Muhammad Taqi Usmani
Translated by Maulana Muhammad Jalaluddin

Price Tk. 90. U.S. $ 5.00 only

উৎসর্গ

আমার শাশুড়ী আম্মার রূহের মাগফিরাত
ও দারাজাত বুলন্দির উদ্দেশ্যে।
যিনি তালিবে ইল্‌মদের খিদমত
করা নিজের জন্য সৌভাগ্যের
কারণ মনে করতেন।

—অনুবাদক

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের
ঐতিহাসিক সফরনামা **'জাহানে দিদাহ'**–এর অনুবাদ

'ফুরাত নদীর তীরে' (প্রথম খণ্ড)

যাতে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও আলজিরিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

'উহুদ থেকে কাসিয়ূন' (দ্বিতীয় খণ্ড)

যাতে সৌদী আরব, জর্দান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

'হারানো ঐতিহ্যের দেশে' (তৃতীয় খণ্ড)

এটি তুর্কিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার ও চীনের সফরনামা।

'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক' (চতুর্থ খণ্ড)

এ অংশে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

অনুবাদকের কথা

اللهم لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك - و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله واصحابه اجمعين إلى يوم الدين -

আল–হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ কারীমের অপার অনুগ্রহে 'হারানো ঐতিহ্যের দেশে' প্রকাশিত হওয়ার কালে আমি আপাদমস্তক দ্বারা একান্তভাবে তাঁরই শুকর গুজারী করছি।

এটি মূলতঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (মুঃ যিঃ আঃ)এর বিশাল ভ্রমণ কাহিনী 'জাহানে দীদাহ'–এর বাংলা তরজমার দ্বিতীয়াংশ।

বিদগ্ধ লেখক তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনীতে বিশটিরও অধিক দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে তিনি এসব দেশের সঙ্গে জড়িত ইতিহাসের কপোলে জ্বলজ্বলকারী অমূল্য রত্নাবলী আহরণ করে বইটিকে বিচিত্র রত্নসমাহারে সমৃদ্ধ করেছেন। উপরন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন।

আমি আসলে 'জাহানে দীদাহ'–এর বিষয় বৈচিত্র, জ্ঞান সম্ভার এবং লেখকের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দুর্বলতা হেতু বইটির তরজমার কাজে হাত দেই। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল তরজমার অঙ্গনে অল্প অল্প পদচারণা করে অনুশীলনের কাজকে চালু রাখা। বাংলায় এর তরজমা প্রকাশ করা আমার কল্পনারও ঊর্ধ্বে ছিল। কারণ আমার কলম সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল হয়ত অন্যরকম। তিনি পথ সুগম করে দিলেন। কাজকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করালেন এবং এর জাহেরী আসবাবও জোগাড় করে দিলেন। অর্থাৎ, 'মাকতাবাতুল আশরাফ'–এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাবর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব বই–এর তরজমাকৃত অংশ দেখলেন এবং তা শেষ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাড়া দিলেন এবং বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন। আমি

আমার দুর্বলতার কথা তাঁকে অকপটে জানালাম। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিলেন এবং দায়িত্ব সচেতন আন্তরিকতার সাথে সংশোধন করে বই আকারে প্রকাশ করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ সেই বই আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এতে ভুল–ত্রুটি ও অসঙ্গতি যা আছে তা সব অনুবাদকের আর সুন্দর ও ভাল যা কিছু আছে, তা বুযুর্গ লেখক ও মাওলানার কৃতিত্ব।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যক্তি ও জায়গার নাম যেগুলো উর্দু থেকে বাংলা করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলো নাম ভিনদেশী ও অজানা থাকার কারণে সঠিকভাবে আদায় করা হয়ত সম্ভব হয়নি। তাই বিশেষভাবে এর ভুল–ত্রুটিগুলো আমাদের গোচরীভূত করার এবং ক্ষমার চোখে দেখার অনুরোধ রইল।

আমার এই কাজ এ পর্যন্ত পৌঁছতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁদের সহযোগিতা ও দু'আ রয়েছে, তাঁদের সকলের নিকট বিশেষ করে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব ও স্নেহের তৈয়ব–এর নিকট আমি চির ঋণী।

আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ইহ–পরকালে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং আমাদের এই মেহনতকে সার্বিকভাবে কবুল করুন। আমীন।

দু'আপ্রার্থী

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

বেজগাতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد

আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগের কথা। পাকিস্তানের বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'তাকবীর'–এর ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট একটি বিজ্ঞাপন আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বিজ্ঞাপনটি ছিল জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন জাষ্টিস মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর বিশটি দেশের ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ' কিতাবের।

আমি এমনিতেই পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেবের লেখার প্রতি মারাত্মক রকমের দুর্বল। এরপর আবার এ কিতাবটি তাঁর সফরনামা।

সুতরাং বিজ্ঞাপনটি দেখেই কিতাবটি সংগ্রহ করি এবং এর বেশ কিছু অংশ সেদিনই পাঠ করি। মূলতঃ কিতাব পাঠের যে অপূর্ব স্বাদ ও আত্মতৃপ্তির কথা আসাতেযায়ে কেরামের মুখ থেকে শুনেছি, তার সামান্য ছিটে–ফোটা আমি এ কিতাবেই অনুভব করি। সাথে সাথে মনের মনিকোঠায় এর বঙ্গানুবাদের দুর্বল ইচ্ছেও হতে থাকে। কিন্তু এর অতি উন্নত রচনাশৈলী উচ্চাঙ্গের ভাষার ব্যবহার আমার সে ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দেয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন এত বৃহৎ কিতাব অনুবাদের কাজে হাত দেয়ার সাহস ও অবকাশ কোনটিই হয়নি।

গত প্রায় ছ' মাস পূর্বে একটি ঘরোয়া দ্বীনী মাহফিলে পরিচয় হলো, নবীন কর্মঠ আলেম বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন সাহেবের সাথে। তিনি সে মাহফিলে একটি উর্দূ কিতাব থেকে পাঠ করে তা বাংলায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। তার মূলানুগ অনুবাদ, উপযুক্ত ও উন্নত ভাষার ব্যবহার আমাকে

বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আমি তাকে প্রয়োজনীয় আরবী–উর্দূ কিতাব থেকে বঙ্গানুবাদ করার প্রস্তাব রাখি। তিনি বললেন, "আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ'–এর কিছু নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেছি।" সাথে সাথে সেগুলো সম্পাদনার অনুরোধও তিনি আমাকে করলেন। আমি তার সে সকল অনুবাদ খুবই আগ্রহের সাথে দেখলাম। তিনি রচনা ও অনুবাদের জগতে নবীন হলেও সামান্য কিছু অসঙ্গতি ছাড়া তার রচনা ও অনুবাদ অনেক প্রবীণের চেয়েও উন্নত। অতএব আমি তাকে পূর্ণ 'জাহানে দিদাহ' অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমার প্রতি সুধারণা বশতঃ উল্টো অনুরোধ করে বসলেন, আপনি সম্পাদনা করলে আমি অনুবাদ করতে প্রস্তুত আছি।

আমাদের বর্তমান আয়োজন 'হারানো ঐতিহ্যের দেশে' হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)–এর ঐতিহাসিক সফরনামা 'জাহানে দিদাহ'–এর তুর্কিস্থান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার ও চীন অংশের বঙ্গানুবাদ।

পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা অনুবাদকে চার ভাগে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ করছি। এদিক দিয়ে প্রতিটি অনুবাদই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রন্থ। 'ফুরাত নদীর তীরে' এর প্রথম অংশ যাতে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও আলজিরিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। 'উহুদ থেকে কাসিয়ূন' দ্বিতীয় অংশ, যাতে সৌদী আরব, জর্দান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সফরনামা বিবৃত হয়েছে। বক্ষমান গ্রন্থ 'হারানো ঐতিহ্যের দেশে' তৃতীয় অংশ, এটি তুকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কাতার ও চীনের সফরনামা। চতুর্থ অংশ 'অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক', এ অংশে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

আমি আমার সাধ্যমত সম্পাদনার চেষ্টা করেছি, তারপরও যদি কোন ভুল-ত্রুটি থেকে যায়, কিংবা কোন অসঙ্গতি কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাদের অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের প্রবল আশা যে, ঐতিহাসিক এ সফরনামা পাঠক মাত্রের অন্তরকেই নাড়া দিবে, উৎসাহিত করবে আমাদের সেই পূর্ব পুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মেহনত ও মুজাহাদার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে শিরক কুফর ও বিদআতের ঘনান্ধকার দূরীভূত করে পৃথিবীকে আবার একটি সোনালী যুগ উপহার দেওয়ার।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

নিবেদক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র
হারানো ঐতিহ্যের দেশে

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুর্কিস্তান সফর	১৫
এথেন্স	১৭
ইস্তাম্বুল নগরীর পরিচিতি	২০
কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণ	২১
সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ্	২৫
স্থলপথে জাহাজ	২৭
সর্বশেষ আক্রমণ ও বিজয়	২৯
কনফারেন্স উদ্বোধন	৩২
সুলতান আহমাদের মসজিদ	৩৫
আত ময়দান	৩৭
তোপকাপে ভবন ও তার দুর্লভ সামগ্রীসমূহ	৩৯
বরকতময় জিনিসসমূহ	৪০
অন্যান্য ঐতিহাসিক দুর্লভ সামগ্রীসমূহ	৪৩
আয়া সুফিয়া	৪৬
বসফরাস প্রণালী ও তারাবিয়াহ	৫০
ইয়ালদায ভবন	৫২
বারবারুসা	৫৫
বিভিন্ন ব্যস্ততা	৫৫
আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) জামে মসজিদ	৫৭
ফাতেহে নামায গাহী	৬০
কাসেম পাশা– স্থলপথে জাহাজ চালানোর স্থান	৬০
গালাতা টাওয়ার	৬২
সোলাইমানিয়া জামে মসজিদ	৬৩
সোলাইমানে আযম	৬৫
নির্মাণ শিল্পী যীনান	৬৬
সোলাইমানিয়া গ্রন্থাগার	৬৬
বন্ধ বাজার (কুবালী জারেশী)	৬৭
তাহ্ফীযুল কুরআন মাদ্রাসা	৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
শেষ দিন	৭১
এমরিগান পার্ক	৭১
রুমেলী দূর্গ	৭২
বসফরাসের পুল ও এশীয় ইস্তাম্বুল	৭৩
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	৭৫
দ্বীপের দেশে	৭৭
বাংলাদেশে কয়েক দিন	৮৯
কাতার সীরাত কনফারেন্স	৯৯
চীন ভ্রমণ	১০৯
বেইজিং এর নিউজে মসজিদ	১১৯
ডং সি জামে মসজিদ	১২৩
নিষিদ্ধ নগরী	১২৩
চীনের প্রাচীর	১২৭
মুং সম্প্রদায়ের কবরস্থান	১৩০
গ্রেট হলে নিমন্ত্রণ	১৩৪
সুপ্রীম কোর্টের ভাইস প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে মধ্যাহ্ন ভোজ	১৩৬
কাংসু প্রদেশ সফর	১৩৯
লিনসা ভ্রমণ	১৪২
লিনসার জামে মসজিদে জুমুআর নামায	১৪৫
সাংহাই ভ্রমণ	১৪৯
সালার জেলায়	১৫০
শিনং শহরে	১৫৩
বেইজিংএ প্রত্যাবর্তন	১৫৫
সার্বিক প্রতিক্রিয়া	১৫৭
চীনে সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা	১৫৮
সাংস্কৃতিক বিপ্লব	১৬০
সাধারণ জীবন যাপন পদ্ধতি	১৬৯
চীনের মুসলমানদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	১৭৩

তুর্কিস্তান সফর

সফরকাল ঃ রজব ১৪০৬ হিজরী
মোতাবেক মার্চ ১৯৯৬ ঈসায়ী

خطّۂ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار
مہدیٔ اُمت کی سطوت کا نشانِ پائیدار
صُورتِ خاکِ حرم یہ سرزمیں بھی پاک ہے
آستانِ مسند آرائے شہِ لولاکؐ ہے
نکہتِ گُل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہَوا
تُربتِ ایّوب انصاریؓ سے آتی ہے صَدا
اے مُسلماں! ملّتِ اسلام کا دِل ہے یہ شہر
سیکڑوں صدیوں کی کشت و خوں کا حاصل ہے یہ شہر

কায়সারের দেশ—কন্সট্যান্টিনোপল ভূমি
উম্মাহর ‘মাহদী’র প্রতাপের স্থায়ী প্রতীক।
হারামের ভূমিসম পবিত্র এ ভূমি।
এটি ‘শাহে লাওলাকের (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ))
গদিনসীনদের চৌকাঠ।
এখানকার বায়ু পুষ্পের সুগন্ধিসম পবিত্র।
আবু আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) সমাধি হতে
সর্বদা ধ্বনি আসে ঃ
হে মুসলমান জাতি ! এ নগরী মিল্লাতে ইসলামের আত্মা।
শত শত বছরের ঘাম ও শোনিতের অর্জন এ নগরী।

তুকিস্তান সফর

মুসলমান জাতির রাজনীতি ও সভ্যতার ইতিহাসে তুরস্কের যে অবস্থান, তা শিক্ষিত কোন মানুষের অজানা নয়। তুর্কীদের বীরত্বগাঁথা আমাদের ইতিহাসের এমন এক সোনালী অধ্যায়, যা নিয়ে প্রত্যেক মুসলমান যথার্থই গর্ব করতে পারে। এই ভূখণ্ড কয়েক শতাব্দীকাল আলমে ইসলামের রাজধানী এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানকার আলেম, ফকীহ, ওলী ও সূফীগণ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় জীবন-চিত্রের বিশাল সম্ভার রেখে গেছেন।

সম্ভবত প্রতিটি মুসলমানের, বিশেষ করে আমার হৃদয়ে তুরস্ক এবং তুরস্কের খেলাফতের নাম উচ্চারিত হলেই ভক্তি ও ভালবাসার আবেগ উথলে উঠে। এই ভক্তি ও ভালবাসা তুর্কী খেলাফতের ইসলাম-প্রীতির ইতিহাস অতীব উজ্জ্বল বলেই শুধু নয়, বরং তা এজন্য যে, শেষকালের অধঃপতিত যুগেও তুর্কী খেলাফত মুসলমানদের ঐক্যের এমন এক প্রাণকেন্দ্ররূপে কাজ করেছে যে, অন্যকিছু না হলেও মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, শৃংখলা ও সংহতি সংঘবদ্ধ ও সুসংহত রেখেছিল এবং এই খেলাফতের ব্যর্থতাই আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অধঃপতনের সূচনা ছিল। যার পর মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেনি। এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেই মরহুম ইকবাল বলেছিলেন—

چاک کردی تُرکِ ناداں نے خلافت کی قبا
سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیّاری بھی دیکھ

অর্থ ঃ নির্বোধ তুর্কীরা খেলাফতের কাবা (পরিধেয়) ছিন্ন করে ফেলেছে। মুসলমানদের সরলতাও প্রত্যক্ষ কর আর খোদাদ্রোহীদের ধূর্ততাও লক্ষ্য কর।

যাই হোক, এসব কারণে তুরস্কের সঙ্গে শুরু থেকেই আমার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং দেশটিকে দেখার বাসনা স্বভাবতই আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কখনো সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি।

১৪০৬ হিজরীর জুমাদাস্ সানিয়া মাসের কথা। একদিন আমি দারুল উলূম করাচীর দাওরায়ে হাদীসের শ্রেণীকক্ষে তিরমিযী শরীফের দরস দিচ্ছিলাম। এমন সময় একজন পিয়ন আমার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রামটি মুসলিম দেশসমূহের সংগঠন 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' (যাকে আরবীতে 'মুনায্যামাতুল মু'তামিরিল ইসলামী' এবং ইংরেজীতে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স)এর জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শরীফুদ্দীন পীরযাদার পক্ষ থেকে এসেছে। তাতে তিনি লিখেছেন—

"ইস্তাম্বুলে লিবিয়ার 'মাজলিসুদ দাওয়াতিল ইসলামী' এবং তুরস্কের 'ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'-এর যৌথ উদ্যোগে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনাকে এতে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হলো।"

কনফারেন্সে অংশগ্রহণের চেয়ে ইস্তাম্বুল দেখার আগ্রহ আমাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে দাওয়াত কবুল করতে অধিক উদ্বুদ্ধ করে। ঘটনাক্রমে সেই সময়েই 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' (বিশ্ব ইসলামী ফেকাহ্ একাডেমী)র এক উপকমিটির একটি অধিবেশন জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল। সেখানে আমার অংশগ্রহণের প্রোগ্রাম ছিল। আমি সেখান থেকেই তুরস্ক যাওয়ার প্রোগ্রাম করি।

আমি জেদ্দার 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র অধিবেশন থেকে অবসর হওয়ার পর পবিত্র মদীনাতে যাই। তিনদিন সেখানে অবস্থান করার পর ৮ই রজব ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ১৯শে মার্চ ১৯৮৬ ঈসায়ীতে মাগরিব বাদ জেদ্দা অভিমুখে যাত্রা করি। জেদ্দায় রাত কাটিয়ে ভোর পাঁচটায় জেদ্দা বিমান বন্দর অভিমুখে রওয়ানা হই।

৯ই রজব ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ২০শে মার্চ ১৯৮৬ ঈসায়ী সকাল নয়টায় সৌদী এয়ারলাইন্সের বিমানে আরোহণ করি। বিমানটি এথেন্স হয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছিল। প্রায় সাত আট ঘন্টা আকাশে উড়ার পর লোহিত সাগর অতিক্রম করে বিমানটি মিসরে প্রবেশ করে। উড়ন্ত বিমান থেকে সুয়েজ খালের দৃশ্য বড় মনোরম লাগছিল। তারপর বিমানটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত কায়রো নগরী অতিক্রম করে। কায়রো নগরীর পশ্চিম প্রান্তে

মিসরের বিশাল আকৃতির পিরামিডত্রয় শিশুদের খেলনার ন্যায় ক্ষুদ্রকায় দেখাচ্ছিল। ইতিপূর্বে মিসরের ভ্রমণ কাহিনীতে কায়রো ও পিরামিডের আলোচনা করেছি।

এথেন্স

প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা আকাশে উড়ার পর বিমানটি গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের বিমান বন্দরে অবতরণ করে। আরবীতে এথেন্সকে 'ইছনা' বলে। এথেন্স অতি প্রাচীন একটি নগরী। ইতিহাসপূর্ব–কাল থেকে এই নগরী আবাদ রয়েছে। এটি গ্রীক দর্শন ও শিল্পকলার বিরাট বড় কেন্দ্র ছিল। এখানে পর পর গ্রীক, রোমান, বাইজেন্টাইন ও ল্যাটিন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে মুসলমানগণ এটি জয় করেন। দীর্ঘ চারশ' বছর তাঁরা এখানে রাজত্ব করেন। ঊনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীতে অঞ্চলটি মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন গ্রীক রাজ্য। কিছুদিন তা জার্মানীর অধীনেও থাকে। বর্তমানে এখানে 'গ্রীক প্রজাতন্ত্র' নামে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, যেখানে মুসলমানগণ প্রায় চারশ' বছর রাজত্ব করেছেন, আজ সেখানে নিয়মতান্ত্রিক একটি মসজিদ পর্যন্ত নেই। একটি হোটেলে নামাযের জায়গা করে নেয়া হয়েছে বলে শুনেছি।

আমি ইতিপূর্বেও একবার আমেরিকা থেকে ফেরার পথে এই বিমান বন্দর হয়ে ফিরেছিলাম। শহরের ভিতরে তখনো যাওয়া হয়নি, তবে দুবারই আকাশ থেকে সম্পূর্ণ শহরের দৃশ্য দেখেছি। প্রথমবার যখন আমি বিমান থেকে এই শহর দেখি, তখনকার সে দৃশ্য এখনও আমার স্মরণ আছে যে, সে সময় শহরের সকল ভবন ছিল সাদা। একটি ভবনও আমি তখন অন্য রঙ্গের দেখিনি। দেখে মনে হল, শহরকে সাদা রাখার জন্য নগর ব্যবস্থাপকগণ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে করে শহরের এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এবার অনেক ভবনই অন্য রঙ্গের দেখতে পেলাম। মনে হল সেই গুরুত্ব এখন আর অবর্া নেই।

গ্রীসকে একসময় বিশ্বের মস্তিষ্ক বলা হত। পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যাদের গবেষণার ফসল থেকে বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞানও ঋণমুক্ত নয়, তাঁরা এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। এ্যারিষ্টোটল, প্লেটো,

সক্রেটিস এবং তারও পূর্বের গণিতশাস্ত্রের আবিস্কারক আরশামিদাস, জ্যামিতি আবিস্কারক উকলিদাস, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভাবক পিথাগোরাস সকলে এই মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন গ্রীসের রাজ্য সীমানাও বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান–বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলায় গ্রীসের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নেই।

এই পৃথিবীতে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কোন সভ্যতাও চিরদিন নিরাপদে থাকেনি। দুদিনের এই খেলাঘরে এমন কত জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে, যার প্রত্যেকটিকে সমকালীন বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা গেছে। কিন্তু তার বিলীন হওয়ার সহজাত সময় এসে গেলে পৃথিবীর বুক থেকে তা এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, ইতিহাসের পাতা থেকে তা খুঁজে বের করতেও অনেক শ্রম ব্যয় করতে হয়।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

["ধরাপৃষ্ঠের সবই ধ্বংসশীল, টিকে থাকবে শুধু আপনার মহিমান্বিত ও মর্যাদার অধিকারী রবের সত্তা।" (সূরা আর রহমান)]

এথেন্স থেকে পুনরায় আকাশে উড়ার পর এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হতে না হতেই বিমান তুরস্কের সীমানায় প্রবেশ করে। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের সম্মুখে সবুজ শ্যামল উপদ্বীপসমূহের ও তৎসংলগ্ন চোখ ধাঁধানো সমুদ্র সৈকতের একটি জাল বিছানো রয়েছে। বিমানের উচ্চতা ক্রমশঃ কমতে থাকে। দূর থেকে দেখা ক্ষুদ্র উপদ্বীপগুলো ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে এবং তার আভ্যন্তরীণ নৈসর্গিক রূপ সৌন্দর্য স্পষ্ট হতে থাকে। ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বিস্তীর্ণ ও সমতল সবুজ শ্যামলিমা এখন উঁচু ঝোপঝাড় এবং দৈত্যাকৃতির বৃক্ষে রূপান্তর হতে থাকে। তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলপ্রপাত ও ঝর্ণাসমূহ দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসে। নয়ন ও মন যখন এই সৌন্দর্য উপভোগে বিভোর ঠিক এমন সময় বিমান ইস্তাম্বুলের বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

এটি আধুনিক ধাঁচের সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় একটি বিমান বন্দর। বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশন ও কাষ্টম্স এর কাজ শেষ করতে কিছু

সময় ব্যয় হল। আমি কাষ্টম্স থেকে বের হতেই এক তরুণ যুবকের দেখা পাই। সে বড় একটি প্লেকার্ডে ইংরেজী অক্ষরে আমার নাম লিখে দাঁড়িয়েছিল। কনফারেন্সের ব্যবস্থাপকগণ যুবকটিকে পাঠিয়েছেন। সে অত্যন্ত উষ্ণ ভালবাসা সহকারে আমাকে স্বাগত জানাল। তারপর আমরা প্রাইভেট কারে আরোহণ করে শহরের দিকে যাত্রা করলাম।

ইস্তাম্বুল শহরের অর্ধেক এশিয়াতে আর অর্ধেক ইউরোপে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে এটিই একমাত্র শহর, যা দুই মহাদেশে বিভক্ত। উভয় অংশের মধ্য দিয়ে বসফরাস প্রণালী প্রবাহিত। বিমান বন্দরটি ইস্তাম্বুলের ইউরোপের অংশে অবস্থিত। মূল শহরটি এখান থেকে বেশ দূরে। কিছুদূর সবুজ শ্যামল উপত্যকা অতিক্রম করার পর শহরের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল শুরু হয়। শহরের একদম শেষ প্রান্তে বসফরাস প্রণালীর তীরে তারাবীয়া হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে পৌছতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগে যায়। গাড়ী আপন গতিতে শহরের নতুন ও পুরাতন অঞ্চল অতিক্রম করতে থাকে। অবশেষে ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে গাড়ী এমন এক সড়কে চলে আসে, যার উভয় দিকে সারি সারি ডুমুর বৃক্ষ দণ্ডায়মান। সড়কটি ক্রমশঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে নেমে গেছে। সবশেষে বসফরাস প্রণালীর পানি আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। বসফরাসের ইউরোপীয় উপকূল প্রায় প্রতি এক ফার্লং, দুই ফার্লং পর পর অর্ধচন্দ্রাকৃতির ধাঁচে গড়া। সেগুলোর মধ্যে সমুদ্রের পানি প্রবেশ করে ছোট ছোট উপসাগরের দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এসব উপসাগরে ছোট ছোট নৌকা থাকে। যেগুলো বিনোদনমূলক নৌভ্রমণ ছাড়াও শহরের এশিয়ার অংশে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এমনি একটি উপসাগর (তারাবিয়া উপসাগর) এর বামদিকে হোটেল তারাবিয়া অবস্থিত। এটি এখানকার নামকরা ফাইভ ষ্টার হোটেল।

যে কক্ষে আমি অবস্থান করি তার পূর্ব দিকের দেওয়াল ছিল কাঁচের। তার মধ্য দিয়ে সর্বদা বসফরাস প্রণালীর নীল পানি এবং তার পশ্চাতের এশিয়ার তীরের সবুজ চাদরাবৃত পাহাড় সারি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এর অবিস্মরণীয় সুন্দর দৃশ্য আমার মস্তিষ্কে আজো উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

বসফরাসের তীরে কিছুসময় ঘোরাফেরা করার জন্য আছর নামাযের

পর হোটেল থেকে নীচে নেমে আসি। হোটেল থেকে বের হয়ে এলে প্রচণ্ড তুষারবায়ুর ঝাপ্টা আমাকে স্বাগত জানায়। মার্চ মাস। পাকিস্তান ও সৌদী আরবে বেশ গরম। সেখানে শীতের শেরওয়ানীও বোঝা মনে হচ্ছিল। যে কারণে আমি গরম কাপড় সাথে রাখিনি। অল্প শীতের পাতলা একটি শেরওয়ানী ছাড়া শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্য কোন রসদ আমার সঙ্গে ছিল না। আমার ধারণাও ছিল না যে, মার্চ মাসেও এখানে এত বেশি শীত হবে। তবুও সাহস করে সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটছিলাম। কিন্তু তুষারবায়ুর কারণে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি ফিরতি ৫০/৬০ গজও অতি কষ্টে অতিক্রম করি। গরম কাপড় ছাড়া যে এখানে চলা সম্ভব হবে না তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। গরম কাপড়ের ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত রুমের ভেতরে থাকাই নিরাপদ মনে করি। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত ও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেই সে রাতের মত অবসর নেই।

পরদিন ছিল জুমাবার। ঐদিন ইস্তাম্বুলের অনেকগুলো ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখার সুযোগ মেলে। সেসব স্থানের আলোচনা করার পূর্বে ইস্তাম্বুলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা জরুরী। এতদ্ব্যতীত পাঠক এই আলোচনা পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারবেন না।

ইস্তাম্বুল নগরীর পরিচিতি

ইস্তাম্বুল তার ভৌগলিক অবস্থান এবং তার পরতে পরতে বিজড়িত ইতিহাসের দিক থেকে বিশ্বের এক ব্যতিক্রমধর্মী নগরী। এর অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এর নামেরও পরিবর্তন হতে থাকে। যত বেশি নামকরণ এই নগরীর হয়েছে, বিশ্বের অন্য কোন নগরীর বোধ হয় এত নামকরণ হয়নি। এর সর্বপ্রাচীন নাম সম্ভবত 'যারগরাদ'। পরবর্তী নাম হয় 'মেইকলাগরাদ'। গ্রীক ও রোমান যুগের শুরুতে একে 'বাইজেন্টাইন' বলা হত। ঈসায়ী তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সম্রাট কন্সট্যান্টিন এই শহরকে তার রাজধানী বানানোর পর তার নাম হয়

'কন্সট্যান্টিনোপল' (Constantinople)। আধুনিক রোমও একে বলা হত। আরবী ইতিহাসে একে 'মাদীনাতুর রূম'ও বলা হয়েছে। বাইজেন্টাইনের লোকেরা একে 'হিপোলিস'ও বলত। 'হিপোলিস' অর্থ শহর। সম্ভবত মাদীনাতুর রূম এরই আরবী তরজমা। মুসলমানরা এই নগরী জয় করার পর কেউ কেউ একে ইস্তাম্বুল বলতে থাকে। তখন তারা এই নাম পরিবর্তন করে 'ইসলাম্বুল' নামকরণ করে। খেলাফতে উসমানিয়ার কোন কোন কাগজপত্রে 'ইসলাম্বুল' নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তার নিয়মতান্ত্রিক সরকারী নাম কন্সট্যান্টিনোপলই থাকে। উসমানী খেলাফতের শেষ যুগে এর 'আল আ–সিতানা', 'দারুস সানকাদা' ও 'আল বাবুল আলী'ও নাম রাখা হয়। খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর ১৯৩০ ঈসায়ীতে তার নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় নাম রাখা হয় ইস্তাম্বুল। নগরীটি বর্তমানে এ নামেই প্রসিদ্ধ।

ঐতিহাসিক দিক থেকেও নগরীটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বলা হয় যে, রোম ও এথেন্স ছাড়া এর সমকক্ষ আর কোন নগরী নেই। এই নগরী দীর্ঘ ১১০০ বৎসর রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। রোমান সাম্রাজ্য তার উত্থানকালে বিশ্বের অদ্বিতীয় পরাশক্তি ছিল। তার সভ্যতা সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টানদের প্রাচ্যের গীর্জার কেন্দ্রীয় শহরও এটিই ছিল। এর পৃষ্ঠপোষককে 'পেট্রিয়ার্ক' (Patriarch) বলা হত। বিধায় খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে এই নগরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর নগরীটি মুসলমানদের হাতে এলে এটিই উসমানী খেলাফতের রাজধানী হয় এবং প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত এটি আলমে ইসলামের প্রাণকেন্দ্ররূপে বিদ্যমান থাকে।

কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণ

ঈসায়ী তৃতীয় শতাব্দীতে রোম সম্রাট কন্সট্যান্টিন ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি এই নগরীকে রাজধানী করার পর থেকে এর নাম কন্সট্যান্টিনোপল হয়ে যায়। এটি তখন একই সময়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং ঈসায়ী ধর্ম উভয়টির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের রূপ লাভ করে। এর এই গুরুত্বের ভিত্তিতেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই

শহরে জিহাদকারী সেনাবাহিনীর জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ)এর খালা উম্মে হারাম বিনতে মুলহান (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমাতার (ধাত্রীমাতা) দিক দিয়ে আত্মীয়া ছিলেন। একদিন দুপুরবেলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। সহসা তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হন। তাঁর চেহারায় তখন মুচকি হাসি বিরাজ করছিল। হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন স্বপ্নযোগে আমাকে আমার উম্মতের সেসব লোককে দেখানো হয়েছে, যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র তরঙ্গের উপর দিয়ে এমনভাবে সফর করবে, যেমন রাজা তার সিংহাসনে উপবেশন করে থাকে।

হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দুআ করুন। আল্লাহ তাআলা আমাকে যেন সে দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন এবং পুনরায় নিদ্রামগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পুনরায় জাগ্রত হলেন। তখন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল খুশীতে উদ্ভাসিত ছিল। হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) পুনরায় এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী (রোম সম্রাট) কায়সারের শহরে (কন্সট্যান্টিনোপলে) জিহাদ করবে তাদের মাগফেরাতের (ক্ষমার) সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) পুনরায় দুআর দরখাস্ত করলেন, যেন আল্লাহ পাক তাঁকেও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এবারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ না, তুমি পূর্বের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সুসংবাদদ্বয় এভাবে বাস্তবায়িত হয় ঃ হযরত উসমান (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) 'কবরিছ' আক্রমণ করেন। ইসলামী ইতিহাসে এটিই প্রথম নৌযুদ্ধ ছিল। এতে হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) তাঁর স্বামী হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাযিঃ)এর সাথে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন। কবরিছবাসী মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে। ফলে সন্ধিসূত্রে মুসলমানরা

এতে বিজয়ী হয়। ফিরতিপথে হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) ঘোড়ায় আরোহণকালে সহসা ঘোড়াটি লাফিয়ে ওঠে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়। সেই আঘাতে তিনি সেখানেই শাহাদাতের অমীয়সুধা পান করেন।

পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) খলীফা হওয়ার পর স্বীয় পুত্র ইয়াযীদ এর নেতৃত্বে কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণ করেন। এই অভিযানে অনেক বুযুর্গ সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)ও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এটিই কন্সট্যান্টিনোপলের প্রথম অবরোধ ছিল। যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। অবরোধ চলাকালেই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) অসুস্থ হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। কন্সট্যান্টিনোপল–প্রাচীরের নীচে তিনি সমাহিত হন। এর বিস্তারিত ঘটনা পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। যাই হোক, এই অবরোধে কন্সট্যান্টিনোপল বিজয় হয়নি। বরং সেনাবাহিনী ফিরে চলে আসে।

হযরত বিশর বিন সুহাইম (রাযিঃ) থেকে এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে—

"নিশ্চয় তোমরা কন্সট্যান্টিনোপল বিজয় করবে। তার আমীর উত্তম আমীর হবে এবং সেই সেনাবাহিনী উৎকৃষ্টতম সেনাবাহিনী হবে।"

সুতরাং এই হাদীসে বর্ণিত সৌভাগ্য লাভের জন্য অনেক মুসলমান শাসক কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক, মাহদী আব্বাসী, হারুনুর রশীদ প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কোন কোন অবরোধ চলাকালে শহরের পাশে যথানিয়মে ভবনসমূহও নির্মাণ করা হয়। কিন্তু তারপরও শহর জয় হয়নি। এর অনেক কারণ রয়েছে—

প্রথমতঃ শহরটি এমন স্থলে অবস্থিত যে, এর চতুর্পার্শ্বে সমুদ্র উপকূল দুর্গের ন্যায় অবরোধ সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ এটি পাহাড়ী অঞ্চল। শীতকালে এখানকার আবহাওয়া আরবের মরুবাসীদের জন্য বিশেষভাবে অসহনীয় হয়ে পড়ত।

তৃতীয়তঃ শহরটির চতুর্পার্শ্বে পরপর তিনটি প্রাচীর ছিল। তাতে ১৭০

ফুট পর পর সুদৃঢ় শৃঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রতিটি প্রাচীর ছিল অত্যন্ত মজবুত। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে একটি অনতিক্রম্য পরিখা খনন করা হয়েছিল, যা ৬০ ফুট চওড়া এবং ১০০ ফুট গভীর ছিল। এই দিক থেকে দুর্গটিকে (শহরটিকে) বিশ্বের সর্বাধিক সুদৃঢ় এবং অজেয় দূর্গ (শহর) মনে করা হত।

চতুর্থতঃ খৃষ্টজগতে কন্সট্যান্টিনোপলের যেই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদা ছিল, তার ভিত্তিতে এই শহরের উপর অন্যের হাত প্রসারিত হতে দেখে সমগ্র খৃষ্টজগত জানবাজি রেখে মোকাবেলা করার জন্য তৈরী হয়ে যেত।

এসব কারণে মুসলমানদের বেশির ভাগ অবরোধ শহরটি জয় করতে সক্ষম হয়নি। কোন কোন সুলতানের শাসনকালে কন্সট্যান্টিনোপলের অধিবাসীরা কর প্রদান করতেও স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু শহর বিজয় হয়নি। তুরস্কের সালজুক শাসকদের পতনের পর উসমানী সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইউনান (গ্রীস) ও এশিয়া মাইনরের অনেক অঞ্চল এর অধীনস্থ হয়। তখন উসমানী সুলতানগণ ইউরোপ বিশেষতঃ কন্সট্যান্টিনোপলের দিকে মনোযোগ দেন। উসমানী বংশের সুলতানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম বায়জিদ ইয়ালদার্‌ম আশপাশের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করার পর ১৪০২ ঈসায়ীতে পূর্ণশক্তি নিয়ে কন্সট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। বায়জিদ তার অসাধারণ বীরত্ব ও দৃঢ়তার কারণে এবং নিপুণ রণকৌশলের কারণে ইউরোপের জন্য আসমানী বজ্রের চেয়ে কম ছিলেন না। আর এ কারণেই তাঁর উপাধি 'ইয়ালদারম' প্রসিদ্ধ হয়। ইয়ালদার্‌ম অর্থ বিদ্যুৎ। বাহ্যিক উপকরণাদির দিক থেকে তাঁর মধ্যে কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের পূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল এবং তিনি এই অভিযানে সফলতার দ্বারপ্রান্তেও পৌছে যান। কিন্তু রাজনৈতিক কিছু কারণে পশ্চাত থেকে তৈমুর লং তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলে আক্রমণ করে বসে এবং বায়জিদের এক পুত্রকেও সে হত্যা করে। যে কারণে বায়জিদ ইয়ালদার্‌ম কন্সট্যান্টিনোপলের অবরোধ তুলে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। বড় দুঃখজনক ঘটনা যে, রোমানদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিবর্তে আনকারা নামক স্থানে তৈমুর লং এর সাথে তাঁকে

বিরাট এক যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধে তৈমুর জয়ী হয়। সে বায়জিদ ইয়ালদারমকে বন্দী করে লোহার শিক পরিবেশিষ্টত একটি পালকিতে করে নিয়ে যায়। সেই বন্দী অবস্থাতেই বায়েজিদের মৃত্যু হয়। ফলে কন্সট্যান্টিনোপলের বিজয় প্রায় ৫০ বছর পিছিয়ে যায়।

বায়জিদের পর তাঁর পুত্র ও বংশধরগণ আপন আপন শাসনকালে কন্সট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু তাঁদেরকেও অবরোধ চলাকালীন সময়ে পশ্চাত বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। যে কারণে তাঁরাও সফলতা লাভ করতে পারেননি।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ

অবশেষে আল্লাহ্ পাক কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের সৌভাগ্য উসমানী খান্দানের সপ্তম তরুণ খলীফা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের ভাগ্যে লিখেছিলেন। তরুণ এই শাহজাদা বাইশ বছর বয়সে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার ফলে অতি দ্রুত তার পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যান। কন্সট্যান্টিনোপল জয়ের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষা করেন। সুনিপুণ কৌশল, অপূর্ব বীরত্ব এবং দৃঢ় সংকল্প দ্বারা তিনি যুদ্ধের এমন নকশা তৈরী করেন, যা শেষ পর্যন্ত বিজয়ের রূপ লাভ করে।

কন্সট্যান্টিনোপলের অধিবাসীরা যুদ্ধের সময় সাধারণত অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট থেকে যে সাহায্য পেত, তা কৃষ্ণ সাগর থেকে বসফরাস প্রণালীতে প্রবেশ করে কন্সট্যান্টিনোপলে পৌছত। তাই কন্সট্যান্টিনোপলকে তার মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বসফরাসের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করা জরুরী ছিল। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বায়জিদ ইয়ালদার্ম বসফরাসের (এশিয়ান) পূর্ব উপকূলে একটি দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। 'আনাযুল দূর্গ' নামে তা প্রসিদ্ধ। দূর্গটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ উপলব্ধি করেন যে, শুধুমাত্র এক তীরের এই দূর্গ বসফরাসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তিনি এই দূর্গের বিপরীত দিকে ইউরোপিয়ান উপকূলে বিশাল এক দূর্গ নির্মাণ করেন। তাকে 'রুমেলী দূর্গ' বলা হয়। এর কিছু বিস্তারিত

আলোচনা আমি পরে করব, ইনশাআল্লাহ। এই দূর্গ নির্মাণের পর বসফরাস প্রণালী হয়ে অতিক্রমকারী প্রতিটি জাহাজকে উসমানীদের উভয়মূখী তোপের আওতায় পড়তে হত।

কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীরসমূহ বিধ্বস্ত করার জন্য সাধারণ তোপ যথেষ্ট ছিল না তাই মুহাম্মাদ ফাতেহ পিতল দ্বারা এমন এক তোপ তৈরী করেন, যার সমকক্ষ কোন তোপ তৎকালীন যুগে পৃথিবীর বুকে ছিল না। এর দ্বারা আড়াই ফুট ব্যাসের আটমন ওজনের গোলা ১ মাইল দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যেত। এই তোপ যখন প্রথম ব্যবহার করা হয়, তখন তার গোলা ১ মাইল দূরে পতিত হয়ে ছয় ফুট মাটির নীচে গেড়ে যায়।

কন্সট্যান্টিনোপল বসফরাস প্রণালী, মরমরা উপসাগর ও গোল্ডেন হর্ন (সোনালী শিং) নামীয় সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। শুধুমাত্র তার পূর্ব দিক ভূমিবেষ্টিত। তাই এর উপর সফল আক্রমণ করার জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর আবশ্যক ছিল। সুতরাং সুলতান ফাতেহ একশত চল্লিশটি যুদ্ধ জাহাজের একটি নৌবহর গড়ে তুলেন।

এই বিশাল প্রস্তুতির পর সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কন্সট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। তার স্থলবাহিনী শহরের পূর্ব প্রাচীরের সম্মুখে অবস্থান নেয়। নৌবহর বসফরাস প্রণালীতে ছড়িয়ে পড়ে। বসফরাসের ছোট একটি শাখা শিং এর আকৃতিতে শহরের পূর্ব দিকে চলে গেছে। একে গোল্ডেন হর্ন (সোনালী শিং) বলা হয়। কন্সট্যান্টিনোপলের নৌবন্দর গোল্ডেন হর্নে (সোনালী শিং) অবস্থিত। এ কারণে বসফরাস থেকে বন্দর অঞ্চল বা শহরের দক্ষিণে যেতে হলে গোল্ডেন হর্ন হয়ে যেতে হয়। কিন্তু কন্সট্যান্টিনোপলের লোকেরা গোল্ডেন হর্নের বসফরাস সংলগ্ন মাথায় লোহার বড় একটি শিকল বেঁধে রেখেছিল, যে কারণে কোন জাহাজ বসফরাস থেকে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে পারত না। ফলে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ এর জাহাজ বসফরাসের বুকেই আটকে যায়। ফলে জাহাজ দ্বারা বন্দর অঞ্চল অবরোধ করার কোন সুযোগ হয় না। যার ফলে শুধুমাত্র পূর্বের স্থলপথেই প্রাচীরের উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। আর শহরের লোকেরা সমুদ্রের দিককে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত মনে করে তাদের সম্পূর্ণ শক্তি পূর্বের প্রাচীরে প্রয়োগ করে।

পাঠক! সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে কন্সট্যান্টিনোপল এবং তার আশেপাশের একটি চিত্র মনে রাখা দরকার।
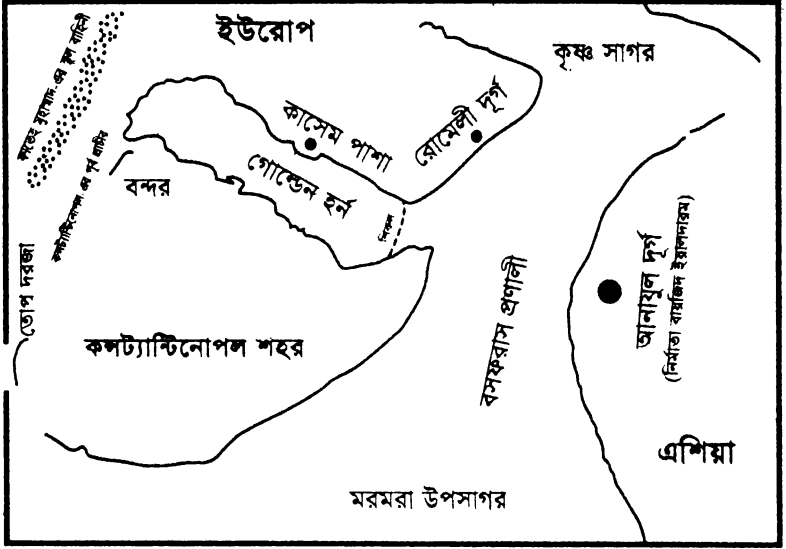
সুলতান মুহাম্মাদ বন্দরের দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য যে কোনভাবে তার কিছু জাহাজ গোল্ডেন হর্নের ভিতর প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু গোল্ডেন হর্নের মুখে লোহার শিকল তো ছিলই, তাছাড়া তার আশেপাশে গোলা নিক্ষেপ করার জন্য তোপও বসানো ছিল। উপরন্তু লোহার শিকল সংরক্ষণের জন্য গোল্ডেন হর্নের মধ্যে বড় বড় বাইজেন্টাইন জাহাজও দাঁড়িয়েছিল। ফলে অনেকদিন অতিবাহিত হলেও গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করার কোন চেষ্টাই সফল হয়নি।

স্থলপথে জাহাজ

অবশেষে একদিন সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে একমাত্র বিরল ও বিস্ময়কর স্মৃতি হয়ে আছে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তার জাহাজগুলোকে

১০ মাইল স্থলপথ অতিক্রম করিয়ে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করাবেন। বসফরাসের পশ্চিম তীর থেকে জাহাজ স্থলে তুলে নিয়ে একটি ঘোরাপথে গোল্ডেন হর্নের দক্ষিণ তীরে পৌছবেন। (এ স্থানটিকে বর্তমানে 'কাসেম পাশা' বলা হয়।) সেখান থেকে সেগুলোকে গোল্ডেন হর্নে নামিয়ে দেবেন। ঐতিহাসিক গিব্বনের বর্ণনামতে সেই দীর্ঘ দশ মাইল স্থলপথটি ছিল পাহাড়ী, বন্ধুর ও অসমতল। মুহাম্মাদ ফাতেহের দৃঢ় সংকল্প এবং তাঁর অকল্পনীয় ও বিস্ময়কর কর্মশক্তি একটি মাত্র রাতে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে দেখায়। প্রথমে তিনি সেই স্থলপথে কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেন। চর্বি দ্বারা ঘসে ঘসে তক্তাগুলোকে পিচ্ছিল করেন। তারপর জাহাজ সদৃশ সত্তরটি নৌকা পর পর বসফরাস থেকে উপরে তুলে সেই তক্তার উপর উঠিয়ে দেন। প্রতিটি নৌকায় দুজন করে মাল্লা ছিল। বাতাসের সাহায্য পাওয়ার জন্য পাল উড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর বলদ ও মানুষ মিলে জাহাজগুলোকে টেনে নিয়ে দশ মাইল দীর্ঘ এই পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে গোল্ডেন হর্নে পৌছে দেয়।

সত্তরটি জাহাজের এই মিছিল সারারাত্রি মশালের আলোতে ভ্রমণ করতে থাকে। বাইজেন্টাইনের সৈন্যরা কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীর থেকে বসফরাসের পশ্চিম তীরে মশালের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ্য করে। কিন্তু অন্ধকারের কারণে কি হচ্ছে তার কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। অবশেষে ভোরের আলো যখন রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে দেয়, ততক্ষণে মুহাম্মাদ ফাতেহের সত্তরটি নৌকা এবং ভারী তোপখানা গোল্ডেন হর্নের উপরাংশে পৌছে গেছে।

স্থলপথে জাহাজ চালানোর অভূতপূর্ব এই কৃতিত্ব, যা ইতিপূর্বে কারো কল্পনাতেও আসেনি—এত অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল যে, পাশ্চাত্যের কট্টর ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেনি। এ্যাডওয়ার্ড গিব্বনের মত ঐতিহাসিকও একে একটি মু'জেযা (Miracle) বলে উল্লেখ করেছে।

উসমানী বাহিনীর নৌকাসমূহ গোল্ডেন হর্নে পৌছার দ্বারা একটি লাভ এই হয় যে, গোল্ডেন হর্নের পানি কম থাকায় বাইজেন্টাইনের বড় বড় জাহাজ তাতে অবাধে চলাফেরা করতে পারছিল না, পক্ষান্তরে উসমানী

জাহাজগুলো তুলনামূলক ছোট হওয়ায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে কোন বাধা ছিল না। ফলে এখানকার নৌযুদ্ধে উসমানী নৌকাসমূহের জয়লাভ করতে কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয়নি। ফলে বন্দরের দিক থেকেও শহরের পরিপূর্ণ সামুদ্রিক অবরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। তার সাথে সাথে মুহাম্মাদ ফাতেহ গোল্ডেন হর্নের উপর একটি পুল নির্মাণ করে তার উপর ভারী তোপ বসিয়ে দেন।

পূর্ব এবং দক্ষিণ উভয় দিক থেকে অবরোধ মজবুত হওয়ার পর উসমানী বাহিনীর তোপ উভয় দিক থেকে নগর রক্ষা প্রাচীরের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলা নিক্ষেপ আরম্ভ করে। সাত সপ্তাহকাল অবিরাম গোলা বর্ষণের পর প্রাচীরের তিন স্থানে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়। গিব্বনের ভাষায়—

"বহু শতাব্দী ধরে যেই প্রাচীরগুলো শত্রুর প্রত্যেক আক্রমণের মোকাবেলা করে আসছিল, উসমানী বাহিনীর তোপ সবদিক থেকে তার আকৃতি বিগড়ে দেয়, তাতে অনেক ফাটল সৃষ্টি হয় এবং সেন্ট রোমানুস এর ফটকের (ফটকটি পরে তোপ দরজা বা তোপকাপে নামে প্রসিদ্ধ হয়) নিকটে চারটি মিনার জমিনের সাথে মিশে যায়।"

এখন সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ চূড়ান্ত হামলার সফলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। কিন্তু তিনি আক্রমণ করার পূর্বে ১৫ই জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরী মোতাবেক ২৪শে মে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সট্যান্টিন এর নিকট এই মর্মে পয়গাম পাঠান যে, তারা অস্ত্র সমর্পণ করে শহর হস্তান্তর করলে প্রজাদের জানমালের কোন ক্ষতি করা হবে না। সাথে সাথে মুরিয়া অঞ্চল তাকে দিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু কন্সট্যান্টিন তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তখন পাঁচ দিন পর সুলতান মুহাম্মাদ সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সর্বশেষ আক্রমণ ও বিজয়

২০শে জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরীর রজনী উসমানী সেনাবাহিনী যিকির–আযকার, তাসবীহ–তাহলিল এবং দুআর মধ্যে কাটিয়ে দেন। কোন কোন বর্ণনায় এও এসেছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ বলেছিলেন,

ইনশাআল্লাহ! আমরা আয়া সুফিয়ার গীর্জায় জোহর নামায আদায় করবো। বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ চলতে থাকে। তবে সেন্ট রোমান্স ফটকে (বর্তমানে তাকে তোপকাপে বলা হয়) বেশি জোর দেয়া হয়। কারণ এখানকার প্রাচীর খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরিখা অতিক্রম করার জন্য তার উপর সিঁড়ি ও জাল ফেলা হয়। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে আগুন ও রক্তের ভীষণ সংঘর্ষ চলতে থাকে। বাইজেন্টাইন বাহিনীও সেদিন অসাধারণ বীরত্বের সাথে লড়তে থাকে। দুপুর পর্যন্ত একটি সৈন্যও শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তাঁর বিশেষ বাহিনী ইয়ানিচারী বাহিনীকে সঙ্গে করে সেন্ট রোমান্স এর ফটকের দিকে অগ্রসর হন। ইয়ানিচারী বাহিনীর নেতা আগা হাসান তার ত্রিশ জন বীর সঙ্গীকে সাথে করে প্রাচীরের উপর আরোহণ করেন। হাসান ও তার আঠারো জন সঙ্গীকে সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর থেকে নীচে ফেলে দেয়া হয়। তারা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। অবশিষ্ট বারো জন প্রাচীরের উপর দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তারপর উসমানী বাহিনীর অন্যান্য দলও একের পর এক প্রাচীরে আরোহণ করতে থাকে। এমনিভাবে কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীরে চন্দ্রখচিত লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়।

বাইজেন্টাইন সম্রাট কন্সট্যান্টিন এতক্ষণ বীরত্বের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করছিল। কিন্তু সে তার কিছু অসাধারণ বীর যোদ্ধার সাহস হারানোর পর নিরাশ হয়ে পড়ে। সে উচ্চস্বরে বলে—

"এমন কোন খৃষ্টান নেই কি, যে আমাকে খুন করবে?"

কিন্তু তার এই আহ্বানের কোন উত্তর না পেয়ে সে রোম সম্রাটদের (কায়সারদের) বিশেষ পোশাক খুলে দূরে নিক্ষেপ করে। অতঃপর উসমানী সেনাবাহিনীর উন্মত্ত তরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে সত্যিকারের সৈনিকের মত বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে নিহত হয়। তার মৃত্যুতে ১১০০ বছরের বাইজেন্টাইনের সেই রোম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে, যার সূচনাও হয়েছিল প্রথম কন্সট্যান্টিনের হাতে এবং বিলুপ্তিও হল আরেক কন্সট্যান্টিনের হাতে। তারপর থেকে কায়সার উপাধিই ইতিহাসের উপাখ্যানে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে ইহ–পরকালের সর্দার মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী সত্যে প্রমাণিত হয়—

اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده

অর্থ ঃ কায়সারের ধ্বংসের পর আর কোন কায়সার জন্ম নিবে না।

যোহরের সময় সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তার উজির ও সর্দারদের সমভিব্যাহারে সেন্ট রোমান্স ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তিনি সর্বাগ্রে কন্সট্যান্টিনোপলের জগতবিখ্যাত গীর্জা আয়া সুফিয়ার দূর্গে পৌঁছে অশ্ব থেকে অবতরণ করেন। গীর্জার প্রাচীরে ছবির কারুকার্য ছিল। সুলতানের নির্দেশে সেগুলো মিটিয়ে দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করা হয়। তখন সুলতানের নির্বাচিত মুয়াজ্জিন আযান দেয়। শিরক ও কুফরের এই কেন্দ্রে প্রথমবার 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এর প্রাণবন্ত ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়। সুলতান এখানে যোহর নামায আদায় করেন। তখন থেকে এই গীর্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

তারপর সুলতান শাহী মহলে প্রবেশ করেন। জাঁকজমকপূর্ণ এসব মহল, যা বহু শতাব্দী ধরে কায়সারদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও তাদের শান-শওকাতের লীলাকেন্দ্র ছিল, আজ তা বিরান পড়ে আছে। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের অন্তরে শিক্ষণীয় এই দৃশ্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, সহসা তার অন্তরে ফেরদৌসীর এই কবিতা উচ্চারিত হয়—

پرده داری می کند بر قصر قیصر عنکبوت
چغد نوبت میزند بر گنبد افراسیاب

অর্থ ঃ

মাকড়শা কায়সারের প্রাসাদের লাজ রাখে,

আফ্রাসিয়ারের (জনৈক বীর) গম্বুজ চূড়ায় পেঁচার নাকাড়া বাজে।

এই হলো কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের সেই ঘটনা, যার পর কন্সট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) উসমানী খেলাফতের রাজধানীর রূপ লাভ করে এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত আলমে ইসলামের মধ্যে তার বিশেষ গুরুত্ব অব্যাহত থাকে।

দুঃখের বিষয়, উসমানী সুলতানদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎসসমূহ ইংরেজীতে। যার অধিকাংশ পাশ্চাত্যের ঐ সকল ঐতিহাসিকের লেখা, যাদের বক্তব্য অন্যায় পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত নয়। মুসলমানদের লিখিত ইতিহাসসমূহ হয় সেসব ইংরেজী উৎস থেকে গৃহীত, অথবা তুর্কী ভাষায় লিখিত। যেগুলো দ্বারা তুরস্কের বাইরের মুসলমানগণ উপকৃত হতে পারেন না। তাই নাজানি কত সত্য ঘটনা আজও রহস্যের পর্দার অন্তরালে রয়েছে। যেগুলো পর্যন্ত পৌঁছার কোন পথ নেই।

যাই হোক! উপরে বর্ণিত এসব ইতিহাস পাশ্চাত্য উৎসসমূহ এবং তার উপর নির্ভর করে লেখা উর্দূ ইতিহাস গ্রন্থের সারাংশ। এই সারাংশ তুলে ধরার পর আমি এখন মূল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ সফরনামার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি।

কনফারেন্স উদ্বোধন

পরের দিন (২১শে মার্চ) জুমাবার। সকাল দশটায় আলোচনা শুরু হবে। তাই আমরা নাস্তা ও অন্যান্য কাজ সেরে সমাবেশ স্থলে চলে যাই। মধ্য ইস্তাম্বুলের ব্যস্ততম একটি অঞ্চলের নামকরা এক অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনা সভা দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে একটি হল, লিবিয়ার 'জামইয়্যাতুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' (ওয়ার্ল্ড ইসলামিক কল সোসাইটি)। সংস্থাটি লিবিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফী ১৯৬৯ ঈসায়ীতে তার ক্ষমতা লাভের পর প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় কর্নেল গাদ্দাফী ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামের সেবায় অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করেছিলেন। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা সেই উৎসাহেরই একটি অংশ। এর অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি অনেক কাজ সম্পাদন করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৮২ ঈসায়ীতে একে আন্তর্জাতিক সংস্থার রূপ দান করা হয়। বিভিন্ন দেশের ৩৬ জন সদস্য নিয়ে এর একটি আন্তর্জাতিক পরিষদ রয়েছে। একটি তাবলীগী সংস্থার সম্ভাব্য যত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে,

তার সবগুলোই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে।

১৯৭৪ ঈসায়ীতে এই সংস্থার অধীনে ত্রিপলীতে 'কুল্লিয়্যাতুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যা' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেমাশকেও এর একটি শাখা রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন দেশের মুসলমান ছাত্ররা 'ইসলামী দাওয়াত' বিষয়ে গ্রাজুয়েশন করে। এখন এতে মাষ্টার ডিগ্রী শুরু করার পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সংস্থাটি লণ্ডনেও একটি 'দাওয়াতে ইসলামী কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেছে। এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদেরকে ইসলামী দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত করা। এই সংস্থার অধীনেই বিভিন্ন মুসলিম দেশে 'জামইয়্যাতুল ইখওয়াহ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাকিস্তানের 'পাক লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতি কেন্দ্র'ও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় সংস্থাটি ইস্তাম্বুলের 'মারকাযুল আবহাছ লিত্‌তারীখ ওয়াছ ছাকাফাহ ওয়াল ফুনুনিল ইসলামিয়্যাহ' যার ইংরেজী নাম, 'সেন্টার অব রিসার্চ অন ইসলামিক হিসট্রি, কালচার এণ্ড আর্টস'। এই সংস্থাটি মুসলিম দেশসমূহের প্লাটফর্ম 'মুনায্‌যামাতুল মু'তামারিল ইসলামী' বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি)এর অধীনে ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রটি ডঃ আকমালুদ্দীন ইহসান উগলুর নেতৃত্বাধীনে খুব উদ্দীপনার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

এই দুই সংস্থা সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর যে কোন ভাষায় পবিত্র কুরআনের যতগুলো তরজমা হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করে প্রকাশ করেছে। তালিকাটি ইস্তাম্বুলে 'মারকাযুল আবহাছের' গবেষকগণ তৈরী করেছেন এবং লিবিয়ার 'জামইয়্যাতুদ দাওয়া' প্রদত্ত অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, তালিকা-গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের আজ পর্যন্ত যত তরজমা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গতম তালিকা।

উক্ত সংস্থাদ্বয়ের ভাষ্য অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ বিরাট বড় একটি পরিকল্পনার সূচনা মাত্র। তাদের সেই পরিকল্পনার সারাংশ এই যে, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের যত তরজমা হয়েছে (বিশেষ করে অমুসলিম দেশের ভাষায়) সেগুলোতে প্রাচ্যবিদদের তরজমাসমূহের

গভীর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচ্যবিদদের তরজমাতে খুব বেশি ভুল এবং অতিরঞ্জন থাকা গোপন কোন বিষয় নয়। তাই এগুলোর উপর নির্ভর করে অন্য যে সব তরজমা বের হয়েছে, সেগুলোর অবস্থা এ থেকেই অনুমান করা যায়। সুতরাং এই সংস্থাদ্বয়ের পরিকল্পনা এই যে, এরূপ সকল তরজমার উপর নিরীক্ষা চালিয়ে এর ভুলগুলো চিহ্নিত করা। তারপর প্রত্যেক ভাষায় বিশুদ্ধ তরজমা প্রকাশ করার প্রচেষ্টা চালান।

বলা বাহুল্য যে, এই কাজ যত বেশি উপকারী এবং জরুরী, ততই জটিল এবং সময় সাপেক্ষও। এই কাজ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ লোক, প্রত্যেক ভাষার পণ্ডিত এবং কুরআনী ইলমে পারদর্শী বিরাট সংখ্যক লোক দরকার। অনেক রসদেরও প্রয়োজন। তাই উভয় সংস্থা মিলে এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে। এতে সেই তরজমা তালিকার পরিচিতি তুলে ধরা হবে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের এমন সব ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত করা হয়েছে, যাঁরা কোন না কোন ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমার কাজ করেছেন বা করছেন।

আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকতা পালন ছিল মাত্র। এতে তুরস্কের তথ্যমন্ত্রীকে বিশেষ মেহমানরূপে দাওয়াত করা হয়। জনাব শরীফ উদ্দীন পীরজাদা, জামইয়্যাতুল দাওয়াতিল ইসলামিয়্যার সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ শরীফ এবং ইস্তাম্বুলের মারকাজুল আবহাছের প্রধান ডঃ আকমলুদ্দীন এহছান উগলু তাদের ভাষণে কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। আগামীকাল থেকে 'কসরে ইয়ালদাজে' কনফারেন্সের মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে, এই ঘোষণা দিয়ে আজকের এই উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

অধিবেশন শেষে মেহমানদের পরস্পর সাক্ষাৎ চলতে থাকে। আমি যখন সৌদী আরব থেকে তুরস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তখন আমার শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ্ আবু গুদ্দাহ (রহঃ) ইস্তাম্বুলের দুইজন লোকের পরিচয় দিয়ে বলেন, তাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। কারণ, তারা অনেকাংশে সমমনা হওয়ার কারণে তোমার এই সফরে সহযোগী হবেন। তাদের একজন ছিলেন, শায়েখ আমীন সিরাজ

সাহেব। দ্বিতীয়জন ডঃ ইউসুফ কালীজ। ইস্তাম্বুল পৌছে আমি তাদের নিকট ফোন করি। তারা বলেছিলেন, কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারাও অংশগ্রহণ করবেন। সুতরাং এখানে তাদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উষ্ণ ভালবাসা ও মুক্ত হৃদয়ে আমার সাথে মিলিত হন। তুরস্কে অবস্থানকালে তাদের দ্বারা অনেক উপকৃত হই।

সুলতান আহমাদের মসজিদ

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর আমন্ত্রিত মেহমানদের ইস্তাম্বুলের জাঁকজমকপূর্ণ 'সুলতান আহমাদ মসজিদে' জুমু'আর নামায আদায় করার প্রোগ্রাম ছিল। সুতরাং এখান থেকে আমরা সকলে মসজিদের দিকে রওয়ানা হই। আমাকে মসজিদ ও অ ান্য ঐতিহাসিক স্থান দেখানোর কাজে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে শায়েখ আমীন সিরাজ সাহেব ও ডঃ ইউসুফ কালীজ আমার সঙ্গী হন। দ্বিপ্রহরে আমরা সুলতান আহমাদ মসজিদে পৌছি।

বড় অসাধারণ এই মসজিদ। তুর্কী স্থাপত্য শিল্পের এটি এক বিস্ময়কর সমাহার। এতে প্রবেশ করতেই মানুষ এর জমকালো রূপ–সৌন্দর্য এবং অসাধারণ প্রভাবে বিমোহিত হয়ে যায়। মসজিদটি তার সৌন্দর্য, কারুকার্য ও জাঁকজমকের দিক থেকে এমন যে, আমি পৃথিবীতে এমন মসজিদ আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬১৬) সুলতান আহমাদ নির্মাণ করেন। খৃষ্টানদের প্রসিদ্ধ গীর্জা 'আয়া সুফিয়া' এই অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট ভবন ছিল। সুলতান আহমাদ নির্দেশ দেন যে, এই ভবনের মোকাবেলায় এমন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক, যা আয়া সুফিয়া ভবন থেকে অধিক উঁচু এবং আড়ম্বরপূর্ণ হবে। সুতরাং এই মসজিদ বাস্তবিকই আয়া সুফিয়া ভবনকে ম্লান করে দেয়। বর্তমানে ইস্তাম্বুলের এই অংশে শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্যকর্ম এই মসজিদ ভবন। এর ছয়টি মিনার মরমরা উপসাগর থেকেও ইস্তাম্বুলের মৌলিকতার প্রতীকরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

একটি বর্ণনায় আছে, (আল্লাহ ভাল জানেন যে এ বর্ণনা কতখানি সঠিক—) সুলতান আহমাদ এই মসজিদ নির্মাণকারী মিস্ত্রীকে বলেন

যে, আমি এই মসজিদকে সর্বদিক দিয়ে আয়া সুফিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ দেখতে চাই। তাই মসজিদের মিনার স্বর্ণ দ্বারা বানানো হোক। রাজমিস্ত্রী এ বিষয়ে অনেক চিন্তা–ভাবনা করেন, কিন্তু স্বর্ণ দ্বারা মিনার তৈরী করা তার নিকট অসম্ভব মনে হয়। অপরদিকে সুলতানের নির্দেশ অমান্য করাও সম্ভব ছিল না। পরিশেষে বাদশাহর অসন্তোষ থেকে বাঁচার জন্য তার মাথায় একটি বুদ্ধি আসে। তা এই যে, তুর্কী ভাষায় স্বর্ণকে 'আলতীন' বলে। এরই প্রায় সমুচ্চারিত একটি শব্দ রয়েছে, 'আলতি'। এর অর্থ ছয়। রাজমিস্ত্রী একথা চিন্তা করে মসজিদের ছয়টি মিনার নির্মাণ করেন যে, বাদশাহ স্বর্ণের মিনার নির্মাণ করার কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেব যে, আপনি যখন বলেছিলেন, তখন আমি 'আলতীন' (স্বর্ণ) এর স্থলে 'আলতি' (ছয়) শব্দ শুনেছিলাম। এজন্য ছয়টি মিনার নির্মাণ করেছি।

একথাও প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তখন পর্যন্ত হারাম শরীফ (মক্কা শরীফ) ছাড়া অন্য কোন মসজিদের ছয়টি মিনার ছিল না। সুতরাং মক্কার সুলতান শরীফ সুলতান আহমাদের মসজিদের মিনার ছয়টি করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন। তার উত্তরে সুলতান আহমাদ হারাম শরীফে আরেকটি মিনার নির্মাণ করে তার মিনার সংখ্যা সাতটি করে দেন। আল্লাহ সর্বোজ্ঞ....।

একটি উঁচু ও প্রশস্ত বেদীর উপর মসজিদ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তার ভিতরের হলকক্ষ চৌষট্টি মিটার লম্বা, বাহাত্তর মিটার চওড়া এবং কমপক্ষে চারতলা সমান উঁচু। সম্পূর্ণ ছাদ নয়নাভিরাম গম্বুজে পূর্ণ। গম্বুজগুলোর বিন্যাস এমন যে, মিম্বারে দণ্ডায়মান খতীবের আওয়াজ মসজিদের সব অংশে সুস্পষ্টভাবে শ্রুত হয়। চতুর্দিকের প্রাচীর এবং ছাদে চীনা মাটির সবুজ এবং নীল শিলা খণ্ড দ্বারা এত মনোরম ও সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হয়েছে যে, আপনা আপনি চোখ তাতে আটকে থাকে। মসজিদের মধ্যে আলো আসার জন্য দুইশ' ষাটটি ঘুলঘুলি এবং জানালা তৈরী করা হয়েছে। উপরে উত্থিত এমন কোন স্থান নেই, যার কোথাও না কোথাও ঘুলঘুলি বা জানালা নেই। কিন্তু একটি থেকে অপরটির দূরত্বের পরিমাপ এমনভাবে সমান রাখা হয়েছে যে, কোথাও সমতা বিঘ্নিত

হয়নি। মরমর পাথরের চারটি স্তম্ভের উপর ছাদ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের পরিধি তেত্রিশ ফুট, যা এক গজ চওড়া এবং চার গজ লম্বা মর্মর পাথর দ্বারা তৈরী।

আমরা মসজিদে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর আযান হল। কেবলা দিকের প্রাচীরে মেহরাব সংলগ্ন মিম্বারটি একতলা পরিমাণ উঁচু। কিছুক্ষণ পর খতীব সাহেব আগমন করলেন। তিনি মিম্বারের সবচেয়ে উপরের ধাপে উঠে বসলেন। মুয়াযযিন নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। আযানের সুমধুর ধ্বনি হারাম শরীফের পুরাতন আযান স্মরণ করিয়ে দেয়। খতীব সাহেব অলংকৃত বিশুদ্ধ আরবীতে সুদীর্ঘ খুতবা প্রদান করেন। খুতবা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। নামাযে কুরআন তেলাওয়াতও তাজবীদপূর্ণ এবং সুমধুর ছিল।

সুন্নাত নামায পড়ে আমরা মসজিদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখি। মসজিদের বাইরে মাদ্রাসা এবং খানকার জন্য কক্ষ নির্মিত আছে। পিছনের বাগানে প্রথম সুলতান আহমাদ, দ্বিতীয় উসমান এবং চতুর্থ মুরাদের মাযারও রয়েছে। সম্পূর্ণ মসজিদে স্থাপত্য শিল্পের প্রত্যেক শাখার উৎকৃষ্টতম কারুকার্যের যেই মনোরম বরং বিস্ময়কর কর্ম দৃষ্টিগোচর হয়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উৎকর্ষতার এই যুগেও এই মানের স্থাপত্যের কথা কল্পনা করতেও বড় বড় স্থাপতির ঘর্মাক্ত হতে হবে, এতে সন্দেহ নেই।

আত ময়দান

আমরা যখন মসজিদ থেকে বের হই, তখন প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছিল। হালকা মেঘের কারণে রোদ ঝিমিয়ে পড়েছে। তুষার বায়ুর কারণে পুরো পরিবেশটাই শীতে থর থর করে কাঁপছে। তবে আমি একটি ওভার কোট যোগাড় করেছিলাম বলে এই প্রচণ্ড শীত কষ্টের কারণ না হয়ে বরং আরামদায়ক মনে হচ্ছিল। সুলতান আহমাদ মসজিদের একেবারে সম্মুখেই পার্কের মত একটি মাঠ রয়েছে। মাঠটি ৩৭০ মিটার লম্বা এবং ১১৮ মিটার চওড়া। বাইজেন্টাইনের শাসনকালে এটি ঘোড় দৌড়ের মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হত। তখন একে 'হপুড্রোম' বলা হত।

এখানে শুধু ঘোড় দৌড়ই হত না, বরং এখানে নতুন সম্রাটের মুকুট পরানোর অনুষ্ঠানও হত। এখানে বিজয়ী সেনাপতিদের সংবর্ধনা দেয়া এবং বিজয় উৎসব উদযাপন করা হত। এখানেই অপরাধীকে ফাঁসি দেয়া হত। বিদ্রোহী খৃষ্টান দলকে আগুনে পোড়ানো হত। বন্য পশুর প্রদর্শনী এবং দৈহিক কসরতের খেলাও এখানেই অনুষ্ঠিত হত। ইতিহাসে বর্ণিত সরকারের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রোহও এই মাঠ থেকেই শুরু হয়। কতবার যে এই মাঠ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তুর্কিদের শাসনকালে তার নাম 'হপুড্রোম' থেকে পরিবর্তন করে 'আত ময়দান' রাখা হয়।

তুর্কিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ময়দানের অসাধারণ গুরুত্ব ছিল। এতে তিনটি স্তম্ভ রয়েছে। একটি স্তম্ভ খৃষ্টপূর্ব চার শতাব্দীর বলে ধারণা করা হয়, দ্বিতীয়টি পঞ্চম খৃষ্ট শতাব্দীর, তৃতীয়টি দশম খৃষ্ট শতাব্দীর। স্তম্ভ তিনটি তিনজন সম্রাট তাদের স্মৃতিচিহ্নরূপে নির্মাণ করেছিলেন। এর দুটি এখন পর্যন্ত অক্ষত আছে। ছোট স্তম্ভটিতে পাথর কেটে বানানো তিনটি অজগর সাপ পেঁচানো ছিল। কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের সময় সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ আয়া ছুফিয়া থেকে বের হয়ে এখানে এসে তাঁর যুদ্ধের ভারী কুড়াল দ্বারা অজগরগুলোর মাথা ভেঙ্গে দেন। যাই হোক, এগুলোকে 'সারপন্ট কলম' (অজগর ওয়ালা খুঁটি) বলে।

আয়া ছুফিয়া এখান থেকে এত কাছে যে, সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শকগণ সেখানে যাওয়ার পূর্বে তুরস্কের জগদ্বিখ্যাত 'তোপকাপে' যাদুঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেছিলেন। কারণ, তা দেখতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া কিছুক্ষণ পর সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকাও ছিল।

সুতরাং আমরা সেখান থেকে গাড়ীতে চড়ে তোপকাপের দিকে যাত্রা করি। তোপকাপেও এখান থেকে কাছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা তার গেটে পৌছে যাই।

তোপকাপে ভবন ও তার দুর্লভ সামগ্রীসমূহ

তুর্কি ভাষায় 'সরায়ে' বলে 'মহল'কে আর 'কাপে' অর্থ দরজা। 'তোপকাপে সরায়ে' এর অর্থ 'তোপ দরজা ভবন'। এ কারণে একে আরবীতে 'কছরু বাবিল মাদফা' বলা হয়। মূলতঃ বাইজেন্টাইন যুগে কন্সট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করার জন্য একটি ফটক ছিল। সে যুগে এটিকে 'সেন্টরুমান্স' দরজা বলা হত। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণকালে মুসলমানরা তাদের ভারি একটি তোপ ঐ ফটকের সামনেই স্থাপন করে এবং মুসলমানদের গোলা নিক্ষেপের কারণে সেই ফটকটিই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ ঐ ফটক দিয়েই শহরে প্রবেশ করেন। এ কারণে ঐ ফটকের নাম 'তোপকাপে' (তোপ দরজা) প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। পরে এখানে একটি মহলও নির্মাণ করা হয়। মহলটি উসমানীয় শাসনকালে (সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ থেকে সুলতান আবদুল মজিদের শাসনকাল পর্যন্ত) সুলতানের বসবাস ও অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। এ মহলটির নাম রাখা হয় 'তোপকাপে সরায়ে' অর্থাৎ 'তোপ দরজা মহল'। বর্তমানে মহলটিকে একটি ঐতিহাসিক ভবন এবং যাদুঘররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। যাদুঘরটিতে রক্ষিত অতি মূল্যবান ও দুর্লভ সামগ্রীসমূহের কারণে একে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ যাদুঘরের মধ্যে গণ্য করা হয়।

মহলের প্রধান ফটকে প্রবেশ করতেই সর্বপ্রথম প্রশস্ত একটি আঙ্গিনা রয়েছে। আঙ্গিনাটি পার হলে 'কছরে মুহাম্মাদ আল ফাতেহ' নামের একটি বিল্ডিং দেখা যায়। এর সম্মুখে একটি বারান্দা রয়েছে। ঐ বারান্দার সামনে উঠানের ঠিক মাঝখানে মাটিতে বড় একটি ছিদ্র রয়েছে। সে যুগে এখানে পতাকা গাড়া হত। এখানে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত খেলাফতে উসমানিয়ার লাল চন্দ্র খচিত পতাকা পতপত করে উড়তে থাকে। এই পতাকা বহু বছর ইউরোপের শক্তিসমূহকে তার সামনে অবনমিত করে রেখেছে। এই পতাকা কয়েক শতাব্দীকাল আলমে ইসলামের ঐক্যের প্রতীক ছিল। এই পতাকা উসমানীয় শাসনকালে বিশ্বের তিন মহাদেশের উপর মুসলমানদের প্রতাপের প্রতীক হয়ে উড়তে থাকে। আজ তার স্মৃতিস্বরূপ শুধুমাত্র ছিদ্রটি রয়ে গেছে। এই

পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত করার পর আজ পর্যন্ত আর সেই পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি।

মহলের যে দরজার সম্মুখে পতাকা উড়ানোর জায়গা ছিল, তাকে 'বাবুস সুআ'দা' বলা হত। এখানে উসমানী সাম্রাজ্যের নতুন রাষ্ট্রপ্রধানগণ খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করতেন। এর সম্মুখ থেকে 'কছরে মুহাম্মাদ আল ফাতেহ' শুরু হয়। 'কছর' (প্রাসাদ) এবং মহল শব্দ বললে সাধারণত জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদের দিকে মন যায়। কিন্তু এই 'কছর' (প্রাসাদ) তা থেকে ভিন্নতর। এর প্রতি পদক্ষেপে এ কথা উপলব্ধি হয় যে, এর নির্মাতাগণ খুব সরলতার সাথে এটি নির্মাণ করেছিলেন। এতে তাঁরা অনর্থ নির্মাণ কর্ম পরিহার করেছেন। মোটের উপর এটি প্রাচীন কালের প্রশস্ত একটি ঘরের মত। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় প্রাসাদের কোন আদল নেই।

ভিতরে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম ছোট একটি কক্ষ রয়েছে। এটি সুলতান আবদুল মজিদের প্রটোকল অফিসারের অফিস কক্ষ ছিল। তারপর তুলনামূলক একটি বড় কামরা রয়েছে। এটি সুলতানের সাক্ষাত কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এর সংলগ্ন আরো একটি কামরা রয়েছে। তার মধ্যে পুরাতন ধাঁচের একটি মশারী টানানো রয়েছে। মশারীটি তৎকালীন যুগের বাদশাহদের ব্যবহৃত মশারীর অনুরূপ। বলা হয় যে, এটি সুলতানের শয়নকক্ষ ছিল। কক্ষটি দেখে অত্যন্ত বিস্ময় জাগল, কারণ, সুলতানের এই শয়ন কক্ষটিও খুবই ছোট। এ কক্ষের নির্মাণ পদ্ধতিতেও কোনরূপ আড়ম্বর চোখে পড়ে না।

'তোপকাপে সরায়ে' বিরাট বড় একটি দূর্গ। এর বিভিন্ন অংশ রয়েছে। দেড়–দুই ঘন্টা সময়ে সব অংশ দেখে শেষ করা সম্ভব ছিল না, তাই এর নির্বাচিত ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ আমরা ঘুরে দেখি।

বরকতময় সামগ্রীসমূহ

সর্বপ্রথম আমরা ইহ–পরকালের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত বরকতময় সামগ্রী রক্ষিত কামরায় প্রবেশ করি। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন তাবাররুক পাওয়া যায়। তবে ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত এই তাবাররুকসমূহ অধিক প্রামাণ্য বলে প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে ইহ–পরকালের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জুব্বা, দুটি তরবারী, তাঁর সেই পতাকা যেটি তিনি বদরের যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে, পবিত্র চুল, পবিত্র দাঁত, মিসরের বাদশা মুকাওকিসের নামে লিখিত তাঁর পবিত্র পত্র এবং তাঁর পবিত্র সিলমোহর অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, এসব তাবাররুক বনু আব্বাসের খলীফাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। পরিশেষে তা সর্বশেষ আব্বাসী খলীফা আলমুতাওয়াক্কিলের ভাগে পড়ে। শেষ বয়সে তিনি মিসরে মামলুক সুলতানদের অধীনে জীবনযাপন করছিলেন। ক্ষমতায় তার কোন হাত ছিল না। দশম হিজরী শতাব্দীতে যখন হেজায ও মিসরের লোকেরা উসমানী সুলতান প্রথম সেলিমের শাসন মেনে নেয় এবং তাঁকে 'খাদিমুল হারামাইন আশশারীফাইনে'র পদে ভূষিত করে, তখন আব্বাসী খলীফা আলমুতাওয়াক্কিল 'খেলাফতে'র পদও সুলতান সেলিমকে অর্পণ করেন। তখন তিনি মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহের চাবি এবং এসব তাবাররুকও খেলাফতের প্রমাণস্বরূপ তাঁর নিকট হস্তান্তর করেন। এরপর থেকেই উসমানী সুলতানগণ খলীফা এবং আমীরুল মুমিনীনের উপাধি লাভ করে এবং সমগ্র আলমে ইসলাম তাঁদের এই মর্যাদা মেনে নেয়।

সুলতান সেলিম দশম হিজরী শতাব্দীতে তাবাররুকসমূহ মিসর থেকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। তিনি গুরুত্ব সহকারে এর যত্ন নেয়ার জন্য 'তোপকাপে সরায়ে'তে সেগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পৃথক একটি কক্ষ নির্মাণ করেন। সুলতানের নিকট এই তাবাররুকসমূহের মূল্য ও মর্যাদা এবং এগুলোর সাথে তাঁর প্রেম ও ভালবাসা কিরূপ ছিল তার অনুমান এর দ্বারা করা যায় যে, যতদিন সুলতান বেঁচেছিলেন ততদিন ইস্তাম্বুলে থাকা অবস্থায় নিজ হাতে এই কক্ষ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতেন। তাছাড়া তিনি এই কক্ষে চব্বিশ ঘন্টা কুরআন তেলওয়াত করার জন্য হাফেয নিযুক্ত করেন। নির্ধারিত সময়ে একদল তেলাওয়াত শেষ করার

পূর্বেই অন্যদল এসে তেলওয়াত শুরু করত। পরবর্তী খলীফাগণও এই ধারা চালু রাখেন। তাই পৃথিবীর সম্ভবত এটিই একমাত্র জায়গা, যেখানে চারশ' বছর পর্যন্ত অবিরাম কুরআন তেলওয়াত হতে থাকে। এই চারশ' বছরের মধ্যে একটি মুহূর্তের জন্যও তা বন্ধ হয়নি। খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর তেলওয়াতের এই ধারাও বন্ধ হয়ে যায়।

তাবাররুকসমূহ অত্যন্ত সুন্দর একটি কাঠের সিন্দুকে ভরে রাখা হয়েছে। বছরে একবার মাত্র রমযান মাসের সাতাইশ তারিখ রাত্রিতে সেগুলো বের করে দেখানো হয়। তাছাড়া অন্যান্য সময় এগুলো সিন্দুকেই বন্ধ থাকে। তাই অন্যান্য সময় তাবাররুক তো দেখা সম্ভব হয় না, শুধু সিন্দুকই দেখা যায়। ফলে আমরা তাবাররুকসমূহের দর্শন লাভ করতে পারিনি। দূর থেকে শুধু সিন্দুকই দেখেছি। আমার পাপী চক্ষু তাবাররুক দেখার যোগ্যতাও রাখে না। পাপী চক্ষুর জন্য তো সেই পাত্র দেখতে পাওয়াও সৌভাগ্যের ব্যাপার, যে পাত্র ঐ সব তাবাররুকের সাহচর্য ও স্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছে।

এসব তাবাররুক যে পর্যায়েরই প্রমাণিত হোক না কেন, কিন্তু একজন উম্মাতের জন্য এর সম্পর্ক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হওয়ার সম্ভাবনা.... শুধু সম্ভাবনাটুকুই কম কিসের।

এই কক্ষেই আরো কিছু তাবাররুক শো-কেসে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে সেগুলো দেখা যায়। তার মধ্যে একটি তরবারী হযরত দাউদ (আঃ)এর সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ), হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযিঃ), হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিঃ) এবং হযরত আবুল হুসাইন (রাযিঃ)এর সাথে সম্পৃক্ত তরবারীসমূহও রক্ষিত আছে। এরই একাংশে কাবা শরীফের দরজার একটি খণ্ড, কাবা শরীফের তালা-চাবি, মিযাবে রহমতের দুটি টুকরা এবং সেই থলেও সংরক্ষিত আছে, যার মধ্যে কোন এক সময় হাজরে আসওয়াদ রাখা হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজার মাটিও রয়েছে। তবে গবেষকদের মতে তরবারীগুলো তাদের হওয়ার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ।

অন্যান্য ঐতিহাসিক দুর্লভ সামগ্রীসমূহ

তাবাররুকসমূহের কক্ষ থেকে বের হয়ে অপর একটি মহলে প্রবেশ করি। মহলটিতে অনেকগুলো কক্ষ রয়েছে। প্রত্যেকটি কক্ষ মহামূল্যবান ও দুর্লভ বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। একটি কক্ষে বিভিন্ন সুলতানের পোশাক এবং হাতিয়ার সংরক্ষিত রয়েছে। সেসব পোশাকের মধ্যে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ এর একটি আবাও (বিশেষ ধরনে জুব্বা জাতীয় ঢিলা গাত্রাবরণী) অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত সুলতান তৃতীয় মোস্তফার স্বর্ণের কারুকার্য করা ইস্পাতের তৈরী পোশাক এবং সুলতান মুরাদের অতি মূল্যবান হাতিয়ারসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমি হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব (রহঃ)এর তুরস্কের ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছিলাম যে, 'প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত কেউ কেউ বলেন, তুরস্ক কোন কালে দেউলিয়া হয়ে গেলেও এই যাদুঘরের (তোপকাপের) স্বর্ণ বেশ কিছুদিন পুরো দেশের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হবে।'

এটি পড়ার সময় বাহ্যত মনে হয়েছিল যে, যারা একথা বলেছে, তারা সম্ভবত কিছুটা বাড়িয়েই বলেছে। কিন্তু তোপকাপের যে অংশে বাদশাহদের দুর্লভ বস্তুসমূহ রক্ষিত আছে, সে অংশ দেখে সত্যিই নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। এগুলো দেখে মনে হল যে, কথাটি অনেকাংশেই সঠিক। সম্ভবত স্বর্ণ, চান্দি ও মনিমুক্তার কারুকার্য খচিত পাত্রসমূহ ও অতি মূল্যবান বস্তুসমূহের এত দুষ্প্রাপ্য, এত দামী এবং এত বড় ভাণ্ডার বিশ্বের অন্য কোন যাদুঘরে নেই।

মূলতঃ এর কারণ এই যে, যেমনটি হযরত মাওলানা নদভী (রহঃ) বলেছেন—উসমানী সুলতানগণ কয়েক শতাব্দী যাবত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমৃদ্ধশালী ও উন্নত অংশের উপর শাসন চালিয়েছেন। বড় বড় রাজ্য এবং বড় বড় সুলতান তাদের প্রভাবাধীন ও করদাতা ছিল। তারা আলে উসমানী সুলতানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, এমনকি তোষামোদ করেও তাদের নিকট অতি মূল্যবান উপঢৌকনসমূহ পাঠাতে থাকে। এসব উপঢৌকন সামগ্রী এবং স্বয়ং সুলতানগণ নিজেদের জন্য ও তাদের বেগমদের জন্য শখ করে যেসব মূল্যবান বস্তু বানিয়েছিলেন, তার

সবগুলোই এখানে সংরক্ষিত আছে।

সুলতান সেলিম ইরানের শিয়া বাদশাহ ইসমাইল ছফভীকে পরাস্ত করে তার রাজসিংহাসন ইরান থেকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। সেই সিংহাসনও এখানে সংরক্ষিত আছে। সিংহাসন তো নয় যেন মনিমুক্তার ভাণ্ডার। এই সিংহাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সমগ্র বিশ্বে এর সমকক্ষ অন্য কোন সিংহাসন আজও তৈরী হয়নি। মানুষের শিল্পকর্মের রাজকীর্তিসমৃদ্ধ এই কক্ষে প্রবেশ করতেই এই সামগ্রীগুলো সত্যিই দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি মানুষের তৈরী ফার্নিচার জাতীয় এত সুন্দর কোন শিল্পকর্ম দেখিনি। সাধারণত মনিমুক্তার কারুকার্য খচিত বস্তু এত ভারী হয়ে যায় যে, তার সৌন্দর্য ঠিক থাকে না, কিন্তু সিংহাসনটির এক ইঞ্চি জায়গাও মনিমুক্তা থেকে খালি না থাকা সত্ত্বেও সেগুলো এমন কৌশলে ও সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে যে, মানুষ তার দিকে শুধু তাকিয়েই থাকে।

সুলতান আবদুল মজীদের যুগের একটি ফোয়ারা দেখলাম। এর দুটি অংশ রয়েছে। প্রত্যেক অংশে ৪৮ কেজি স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ ফোয়ারাতে ৯৬ কেজি খাঁটি স্বর্ণ রয়েছে। তার বিভিন্ন অংশে ৬ হাজার ৬ শ' ৬৬টি হিরা বসানো আছে।[১]

খাঁটি স্বর্ণের নির্মিত কয়েকটি বড় বড় বাতিদান দেখলাম, যার এক একটিতে কমপক্ষে বিশ কিলো করে স্বর্ণ ব্যয় হয়েছে।

ইতিপূর্বে হীরা ও রত্নের নামই শুধু শুনেছিলাম, কিন্তু কখনও প্রকৃত হীরা দেখার সুযোগ ঘটেনি। এখানে চামচের মত সরু ও গোলাকৃতির অতি বড়, সুন্দর ও ঐতিহাসিক একটি হীরক খণ্ডও দেখলাম। একে 'কশক চেআলমাচি' বলা হয়। এর ওজন ৮৬ ক্যারট। তার চতুর্দিকে রয়েছে স্বর্ণের সুন্দর ফ্রেম। হীরাটির ঔজ্জ্বল্য এত বেশি যে, ঠিক এরূপ

টীকা–১ ঃ প্রকৃতপক্ষে বিলাসিতা ও অপচয়ের এ অবস্থাই বিভিন্ন জাতির বিশেষ করে মুসলমানদের অধঃপতনের জন্য প্রধানত দায়ী। সুলতান আবদুল মাজীদ তুরস্কের সেই সময়ের সুলতান ছিলেন, যখন তুরস্ক অধঃপতনের শেষ কাল অতিক্রম করছিল। যখন তুরস্ক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত অসুস্থ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, এই অবস্থাতেও বিলাসিতার এই মারত্মক অবস্থা পরিপূর্ণ ধ্বংস ছাড়া আর কি পরিণতি বয়ে আনতে পারে?

মনে হয় যেন চীনা মাটির অত্যন্ত স্বচ্ছ একটি গ্লোবের মধ্যে অদৃশ্য একটি বাল্ব জ্বলছে। তার উজ্জ্বল্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তার দিকে দেখলে চোখ অন্ধকার হয়ে যাবে।

হীরাটি ছিল ভারতের এক মহারাজার। ফ্রান্সের এক জেনারেল তা খরিদ করে ফ্রান্সে নিয়ে যায়। খ্যাতনামা ফ্রান্স বিজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মা তার নিকট হতে এটি ক্রয় করেন। নেপোলিয়ান তখন দেশান্তরের জীবন যাপন করছিলেন। তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে বিরাট অংকের টাকার প্রয়োজন ছিল। তাই নেপোলিয়ানের মা তুর্কি জেনারেল আলী পাশার নিকট এই হীরা দেড়শ' মিলিয়ন (১৫ কোটি)এর বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। ফলে এটি উসমানী ধনভাণ্ডারে চলে আসে এবং এই যাদুঘরের শ্রীবৃদ্ধি করে।

সুলতান মুহাম্মাদের একটি খঞ্জরও দেখলাম। বলা হয় যে, এটি বিশ্বের সর্বাধিক মূল্যবান খঞ্জর। এটিও মনিমুক্তা খচিত। এতে তিনটি জমরদ পাথরও বসানো আছে। তার হাতলের উপর ঢাকনাওয়ালা একটি ঘড়িও রয়েছে।

এছাড়া একটি কক্ষ সেসব রাজ উপঢৌকন এবং রাজমোহর এর জন্য নির্ধারিত, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন সুলতান উসমানী খলীফাদের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছে। এরও অধিকাংশ জিনিস স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত। তার মধ্যে অতি মূল্যবান রাজমোহর, সাজদানী, বাতিদানী, হাতিয়ার, পাত্র, অলংকার প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। উপরে উল্লেখিত ছফভীর রাজ সিংহাসন ছাড়া আরও অনেক রাজার সিংহাসন রয়েছে। তার মধ্যে কোন কোনটি সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী এবং মনিমুক্তা খচিত।

মোটকথা, এই যাদুঘরে বাস্তবিকই এমন সব দুর্লভ বস্তু আছে, যার এক একটির পরিচয় দানের জন্য পৃথক পৃথক প্রবন্ধ প্রয়োজন। আর তাই যে ব্যক্তি বলেছে যে, তুরস্ক দেউলিয়া হলেও বেশ কিছুদিন তোপকাপের দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী দ্বারা দেশ চলবে তার সে কথা বাহ্যত ভুল নয়।

নিঃসন্দেহে এই যাদুঘর পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের জন্য মনোমুগ্ধকর

বিনোদন কেন্দ্র। কিন্তু তার চেয়ে অধিক এটি একটি শিক্ষণীয় স্থানও বটে। সেই ধনসম্পদ এবং প্রভাব প্রতাপ, যার জন্য মানুষ মানুষের গলা কেটেছে। যার পেছনে মানুষ তার সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। যার জন্য মানুষ যুদ্ধ করেছে। তার একটি বস্তুও তাদের সাথে যায়নি। তারা সকলে দুনিয়া ত্যাগ করার সময় খালি হাতেই চলে গেছে। পরবর্তীতে এসব পার্থিব জাঁকজমক অন্যের হাতে চলে এসেছে। অবশেষে তা পর্যটকদের বিনোদন সামগ্রীরূপে রয়ে গেছে। এটি এমন এক অবিস্মরণীয় বাস্তবতা, যা মানুষ সর্বদা বিস্মৃত হয়ে যায়। মানুষ যদি তার জীবনের পরিকল্পনা করার সময় ভবিষ্যতের এই বাস্তবতা স্মরণ রাখত, তাহলে লড়াই–ঝগড়া ও অন্যায়–অবিচারের নরক এই পৃথিবী শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তার পুষ্প কাননে পরিণত হত।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে পৃথিবীর এই বিরল যাদুঘর থেকে ফিরে এলাম। আয়া সুফিয়া আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়ী সেই ঐতিহাসিক উপাসনালয়ের দরজায় উপনীত হল।

আয়া সুফিয়া

আয়া সুফিয়া সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের হাতে কন্সট্যান্টিনোপল বিজয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খৃষ্টানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থস্থান ছিল। আনুমানিক পঞ্চম খৃষ্ট শতাব্দী থেকে খৃষ্ট জগত বড় বড় দুটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমটি ছিল প্রাচ্যে। কন্সট্যান্টিনোপল ছিল তার রাজধানী। বলকান, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিসর এবং ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নেতাকে 'পেট্রিয়ার্ক' (Patriarch) বলা হত। অপর সাম্রাজ্যটি ছিল পাশ্চাত্যে। তার প্রধান কেন্দ্র ছিল রোমে (ইটালীতে)। ইউরোপের বেশির ভাগ অঞ্চল এর অধীনে ছিল। এখানকার ধর্মীয় নেতাকে পোপ বা পাপা বলা হত। এই সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে সর্বদা রাজনৈতিক বিরোধ ছাড়াও ধর্মীয় এবং গোষ্ঠীগত বিরোধ লেগেই থাকত। রোমকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যটি ছিল রোমান ক্যাথলিকদের। তাদের গীর্জাকে বলা হত রোমান ক্যাথলিক চার্চ। আর প্রাচ্যের সাম্রাজ্যের গীর্জাকে দি হলি আর্থোডক্স চার্চ

বলা হত। আয়া সুফিয়ার এই গীর্জা আর্থোডক্স চার্চের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল। এই চার্চের প্রধান পেট্রিয়ার্ক এখানেই অবস্থান করতেন। যে কারণে অর্ধেক খৃষ্ট জগত এই গীর্জাকে পবিত্রতম উপাসনালয় বলে মনে করত।

রোম ও কন্সট্যান্টিনোপলের গীর্জাদ্বয়ের মধ্যে রোমের গীর্জার তুলনায় আয়া সুফিয়া অধিক প্রাচীন বলে তা এক ভিন্নতর মর্যাদার অধিকারী ছিল। তৃতীয় খৃষ্ট শতাব্দীতে রোমের প্রথম খৃষ্টান সম্রাট কন্সট্যান্টিন এই গীর্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেই সম্রাটের নামে এই শহরের নাম বাইজেন্টাইন থেকে কন্সট্যান্টিনোপল হয়।

কন্সট্যান্টিন ৩৬০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে কাঠের তৈরী একটি গীর্জা নির্মাণ করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গীর্জাটি অগ্নিদগ্ধ হলে সেই জায়গাতেই সম্রাট জাষ্টিনাইন ৫৩২ খৃষ্টাব্দে পাকা করে তার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। দশ হাজার রাজমিস্ত্রী এই নির্মাণ কাজ করে। এর নির্মাণ কাজ পাঁচ বছর দশ মাসে পূর্ণ হয়। এতে দশ লাখ পাউণ্ড ব্যয় হয়। কায়সার এর নির্মাণ কাজে বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের মর্মর পাথর ব্যবহার করে। সুতরাং ফারীজিয়ার শুভ্র, লাকুনিয়ার সবুজ, লিবিয়ার নীল, সালটাকের কৃষ্ণ, বসফরাসের কালো রেখা বিশিষ্ট মর্মর পাথর, মিসরের সিতারা পাথর এবং ছাসাক পাথর সংগ্রহ করে এতে ব্যবহার করে। এর নির্মাণ কাজে বিশ্বের উৎকৃষ্টতম মশলা ব্যবহার করা হয়। সমগ্র বিশ্বের গীর্জাসমূহ এর নির্মাণ কাজে অনেক দুর্লভ উপহার পাঠায়। বর্ণিত আছে যে, জাষ্টিনাইন গীর্জার কাজ পূর্ণ হওয়ার পর যখন প্রথমবার তাতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি বলেন, সুলাইমান[১] ! আমি তোমার অগ্রে চলে গেছি।

প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত এই ভবন শুধুমাত্র গীর্জারূপেই নয় বরং সমগ্র খৃষ্ট জগতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। খৃষ্টানদের ধারণা ছিল যে, এই গীর্জা কখনই তাদের হাতছাড়া হবে না। এর সঙ্গে খৃষ্টানদের এমন আবেগপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যে, শত শত বছর ধরে তা তাদের হাতছাড়া হবার পরও 'আর্থোডক্স চার্চ' এর প্রধান এখনও পর্যন্ত তার নামের সঙ্গে The Head of the Church of the

টীকা ঃ ১. হযরত সুলাইমান (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। ধৃষ্টতাপূর্ণ এই বাক্যে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে, যেন আয়া সুফিয়া স্বীয় মর্যাদায় বাইতুল মুকাদ্দাসকেও ছাড়িয়ে গেছে। (আল্লাহ মাফ করুন)

Constantinople (কন্সট্যান্টিনোপল দূর্গ প্রধান) লিখে আসছেন।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের সৈন্যবাহিনী যখন কন্সট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করে এবং সামরিক দিক থেকে বাইজেন্টাইনরা পরাস্ত হয়, তখন শহরের ধর্মীয় নেতারা এবং দৃঢ় বিশ্বাসী খৃষ্টানরা গীর্জাটিতে এই বিশ্বাসে আশ্রয় গ্রহণ করে যে, কমপক্ষে এই ভবন শত্রুবাহিনী দখল করতে পারবে না। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এ্যাডওয়ার গিব্বন এই দৃশ্যের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে লেখেন ঃ

“গীর্জার ভূমি এবং তার উপরোস্থ গ্যালারীসমূহ পিতা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, পাদ্রী, রাহেব ও কুমারী মেয়েদের ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অধিক ভীড়ের কারণে গীর্জার দরজা দিয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব লোকেরা সেই পবিত্র গম্বুজের ছায়ায় আত্মরক্ষার পথ সন্ধান করছিল, যাকে তারা দীর্ঘকাল ধরে ঊর্ধ্ব জগতের অপার্থিব এক ভবন বিশ্বাস করে আসছিল। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি এক অতি উৎসাহী বা বানোয়াট কথার প্রবক্তা এক খৃষ্টানের একটি ইলহাম ছিল। সে সুসংবাদ প্রদান করেছিল যে, “একদিন তুর্কী জাতি কন্সট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করবে এবং রোমানদের পিছু নিয়ে সেন্ট সুফিয়া গীর্জার সম্মুখস্থ কন্সট্যান্টিনের নামে সম্পৃক্ত স্তম্ভ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু এখান থেকেই তাদের বিপদের সূত্রপাত হবে। কারণ, তখন আসমান থেকে তরবারী হাতে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে। আসমানী সেই ফেরেশতা অস্ত্র ও সাম্রাজ্য এমন এক দরিদ্র ব্যক্তির নিকট অর্পণ করবে, যে ব্যক্তি সে সময় ঐ খুঁটির নিকট বসা থাকবে। ফেরেশতা তাকে সম্বোধন করে বলবে, এই নাও তরবারী, এর দ্বারা আল্লাহওয়ালাদের প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সঞ্জীবনীপূর্ণ এই বাক্য শুনতেই তুর্কীরা পালাতে থাকবে। রোমানরা তাদেরকে মরক্কো এবং আনাতুলিয়া থেকে ইরান সীমান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে দেবে।”

কিন্তু তুর্কীরা সেই স্তম্ভ ছেড়ে আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সেন্ট সুফিয়ার ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন কোন ফেরেশতাই অবতীর্ণ হয়নি এবং রোমানদের পরাজয় বিজয়েরও রূপ নেয়নি। গীর্জায় আশ্রয় নেওয়া ঈসায়ী লোকেরা শেষ সময় পর্যন্ত কোন অদৃশ্য সাহায্যের প্রতীক্ষা করতে থাকে। অবশেষে সুলতান মুহাম্মাদের হাতে তাদের তেলেসমাতী ও

বিশ্বাসগত এই ধারণা চিরতরে মাটিতে মিশে যায়।

কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের দিন সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ইনশাআল্লাহ! আয়া সুফিয়াতে আমরা যোহর নামায আদায় করব।' আল্লাহ পাক তাঁর এই ঘোষণার মর্যাদা রক্ষা করেন। এই ভূখণ্ডে প্রথম যোহর নামায এই ভবনেই আদায় করা হয় এবং পরবর্তী প্রথম জুমুআর নামাযও এখানে আদায় করা হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ এই গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন[১]।

এর প্রাচীর থেকে ছবিসমূহ মিশিয়ে দেন। মেহরাব কেবলার দিকে করে দেন। সুলতান এর মিনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তারপর থেকে আয়া সুফিয়া জামে মসজিদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এতে প্রায় পাঁচশ বছর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাত হতে থাকে। কিন্তু খেলাফত বিলুপ্তির পর মোস্তফা কামাল পাশা তার শাসনকালে এই মসজিদে নামায বন্ধ করে দিয়ে তাকে একটি যাদুঘরে রূপান্তরিত করে। ইস্তাম্বুলের কামালী শাসনকালের এক দুঃখজনক ফল এটিও যে, আজ পর্যন্ত এই মসজিদ যাদুঘররূপে বহাল আছে। সেখানে সর্বদা বিদেশী পর্যটকেরা ঘুরে বেড়িয়ে থাকে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ূন।

আয়া সুফিয়ার সম্মুখে সুন্দর একটি বাগান রয়েছে। বাগান অতিক্রম করে আমরা তার প্রধান ফটকে পৌছি। ফটকের উভয় দিকে সেই পাথর স্থাপিত রয়েছে, যেখানে প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকত। কয়েক শতাব্দী ধরে সর্বদা দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকায় পাথরগুলোতে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তা সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

ভিতরের হল কক্ষে প্রবেশ করলাম। হল কক্ষটি অনেক প্রশস্ত ও বিস্তৃত, প্রায় চতুর্ভুজ। মেহরাব এবং ভিতরের পথ ভিন্ন উত্তর–দক্ষিণে তার বিস্তৃতি দুইশত পয়ঁত্রিশ ফুট। মাঝের গম্বুজের ব্যাস ১০৭ ফুট। ছাদের উচ্চতা ১৮৫ ফুট। মোট স্তম্ভ ১৭০টি। চারপাশের দেওয়ালে ছয়টি

টীকা ঃ ১. সুলতান মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করার পরও যেহেতু কন্সট্যান্টিনোপল জিহাদের মাধ্যমে বিজয় হয়, তাই মুসলমানরা এসব গীর্জা অক্ষত রাখতে বাধ্য ছিল না। বিশেষ করে আয়া সুফিয়ার সাথে ধর্ম সংক্রান্ত যেসব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। তা চিরতরে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যেও তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ঢালে মুসলমানগণ 'আল্লাহু', 'মুহাম্মাদ', 'আবু বকর', 'উমর', 'উসমান' ও 'আলী' সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে টানিয়েছে। তুরস্কের বেশির ভাগ মসজিদেই এসব নাম লিখিত বোর্ড ঝুলানোর প্রচলন দেখা যায়।

ভবনটিতে প্রবেশ করার পর মন মস্তিষ্ককে এই চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে যে, নাজানি এই মাটিতে কয়েক শতাব্দী যাবত কত মুসলমান স্বীয় প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সেজদা করতে থাকে।

پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں
خاموش اذانیں ہیں تری بادِ سحر میں

অর্থ ঃ তোমার মাটিতে সেজদার নিদর্শন লুকিয়ে আছে কত।
নীরব আযান রয়েছে তোমার ভোরের বায়ুতে অবিরত।

কামাল আতাতুর্ক তার মনগড়া 'সংস্কার কর্মের' অধীনে মসজিদটিকে শুধুমাত্র পর্যটন কেন্দ্রই বানায়নি, বরং এখানে নামায পড়া আইনত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আতাতুর্কের যুগ থেকে যদিও এখানে একাকী নামায পড়ার অনুমতিও ছিল না, তবে বর্তমানে এই নিয়ম ক্রমশঃ শিথিল হতে চলেছে। সুতরাং আছর নামায আমরা এখানেই আদায় করি। আমাদেরকে কেউ কিছু বলেনি। আয়া সুফিয়া থেকে বের হয়ে আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

বসফরাস প্রণালী এবং তারাবিয়াহ

আমি পরদিন ভোরে ফজর নামাযান্তে হোটেল থেকে বের হয়ে বসফরাস প্রণালীর তীরে হাঁটতে যাই। এখানকার দৃশ্য মন কেড়ে নেয়ার মত। বাল্যকাল থেকেই বসফরাসের নাম শুনে আসছি। তার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বের বিষয়ও বিভিন্ন বইয়ে পড়েছি। কল্পনা শক্তি এর যে চিত্রাংকন করেছিল, বাস্তবে তা আরো বেশি সুন্দর। এই প্রণালীটি উত্তর–দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর এবং মরমরা সাগরের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। পূর্ব–পশ্চিমে ইউরোপ ও এশিয়া এই দুই মহাদেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের কাজ করেছে। উভয় দিকের সবুজ উপকূলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নীলনদের মনোহারী এই দৃশ্য ১৮ মাইল দীর্ঘ। এর উত্তরের

মুখটিই বেশি প্রশস্ত। সেখানে এর প্রশস্ততা পৌনে তিন মাইল। আর সবচে' কম চওড়া রোমেলী দূর্গের সম্মুখে। সেখানে এর মোট পরিসর ৮০০ গজ। বিভিন্ন স্থানে এর গভীরতা ৪০ গজ থেকে ১৩২ গজ।

পূর্বে বসফরাসের এশিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলকে 'আনাতুলিয়া' বলা হত। এ অঞ্চলটি কন্সট্যান্টিনোপল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বর্তমানে ইস্তাম্বুল শহর বৃদ্ধি পেতে পেতে এশিয়ার উপকূল ধরে অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে। এখন এ অঞ্চলকে 'ইসকোদার' বলা হয়। একমাত্র ইস্তাম্বুলই এমন একটি শহর, যার অর্ধেক ইউরোপে এবং অর্ধেক এশিয়ায় অবস্থিত। সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ একটি সেতু দ্বারা শহরের উভয় অংশে সংযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বসফরাস প্রণালী বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। তাই কিছুক্ষণ পরপরই এখান দিয়ে ছোট–বড় জাহাজ অতিক্রম করতে থাকে। আমি এখন বসফরাসের ইউরোপের উপকূলে দাঁড়িয়ে। আমার সম্মুখে বসফরাসের তরঙ্গমালা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ধেয়ে চলেছে। তার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট নৌকা এবং মধ্যম ধরনের জাহাজ তীব্রবেগে ছুটে চলেছে। এ সবের ওপারে এশিয়ার উপকূলের সবুজাবৃত পাহাড়সারি এবং সেখানকার সুদৃশ্য ভবনসমূহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ছোট এই জলপথ ইতিহাসের কত উত্থান–পতনই না প্রত্যক্ষ করেছে। সম্মুখের এশিয়ার উপকূলে কিসরার সেই বিশাল সেনাবাহিনীর ছাউনি কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে, যারা রোম সম্রাট কায়সারের সেনাবাহিনীকে অবিরত পরাজিত করতে করতে কন্সট্যান্টিনোপলে অবরুদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু তারপরই সহসা পবিত্র কুরআনের বিস্ময়কর সেই ভবিষ্যৎবাণী 'রোমানরা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর জয়ী হবে' পূর্ণ হয়। এবং কিসরার সৈন্যবাহিনীকে এখান থেকে পালাতে হয়। কখনও বসফরাসের পানিতে উসমানী নৌবহরের চলাফেরা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কখনো এখানে আগুন ও ধোঁয়ার মেঘ ভাসতে দেখা যাচ্ছিল। মোটকথা, কল্পনার প্রবাহ বসফরাসের তরঙ্গের সাথে সাথে প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে তারাবিয়া উপসাগরের মোড় এসে যায়। মোড়ের অদূরে হোটেল তারাবিয়া দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে আমি উঠেছি।

তারাবিয়া উপসাগরে উসমানী যুগ থেকে বহির্দেশের রাষ্ট্রদূতদের বসতি ছিল। বহির্দেশের দূতাবাসগুলোও এখানেই বানানো হত। বর্তমানে এটি ইস্তাম্বুলের একটি শহরতলী। এখানে বেশির ভাগ হোটেল, রেঁস্তোরা এবং ছোট ছোট বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে। উপসাগরে ছোট ছোট অনেক নৌকা রয়েছে, যেগুলো বসফরাস অতিক্রম করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ইয়ালদায ভবন

নাস্তার পর কনফারেন্সের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন ছিল। অধিবেশনটি কসরে ইয়ালদায নামে খ্যাত সুলতান আবদুল হামীদের মহলে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাফত বিলুপ্তির পর মহলটি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। বর্তমানে এই মহলে 'মারকাযুল আবহাছের' কার্যালয় খোলা হয়েছে, যার পরিচালনাধীনে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এখানে কয়েক ঘন্টা কনফারেন্সের কাজে ব্যয় হয়। কনফারেন্স শেষে ব্যবস্থাপকগণ মারকাজুল আবহাছের বিভিন্ন অফিস ঘুরিয়ে দেখান। মারকাযের পৃষ্ঠপোষক ডঃ আকমালুদ্দিন ইহসান উগলু জ্ঞান-রুচির অধিকারী তুর্কী বংশোদ্ভূত তরুণ যুবক। তিনি আরবী ও ইংরেজীতে সাবলিলভাবে কথা বলেন। এই মারকাযকে এবং বিশেষ করে এর গ্রন্থাগারকে তিনি অতি রুচিসম্মত করে বিন্যস্ত করেছেন। গ্রন্থাগারটিতে ইসলামী জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডার দেখতে পেলাম এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক লেখককে কর্মরত পেলাম।

'মারকায' পরিদর্শনের পর কসরে ইয়ালদাযের বিভিন্ন অংশও ঘুরে দেখি। সাদামাটা একটি মহল। রাজকীয় বাগাড়ম্বর সেখানে অনুপস্থিত। উসমানী খেলাফতের শেষ যুগের সমৃদ্ধশালী খলীফা সুলতান আবদুল হামীদ এখানেই বাস করতেন। তার দফতরসমূহও এই ভবনেই ছিল। সবগুলো ভবন খুব সাদাসিধা। আড়ম্বরতা ও বাড়াবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই।

মহলটি মধ্য ইস্তাম্বুলের সুউচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সেখান থেকে ইস্তাম্বুল শহরের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখা যায়। মহলের বাইরে পাহাড়ের উপরেই একটি পার্ক রয়েছে। মহলের দরজা সংলগ্ন একটি মসজিদও রয়েছে। সুলতান আবদুল হামীদ এটি নির্মাণ করেন। এই মসজিদেই তিনি নামায আদায় করতেন। কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে

আমরা এখানেই নামায আদায় করি। মসজিদটি অতি সুন্দর। তুরস্কের অন্যান্য মসজিদের আদল এটিতেও বিদ্যমান। মসজিদটি সুলতান আবদুল হামীদের স্মৃতি বহন করে আসছে। তাই এতে তার কয়েকটি স্মরণীয় বস্তুও সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র লোম। কিন্তু সবসময় এর দর্শন সম্ভব হয় না। এর জন্যও নির্দিষ্ট তারিখ রয়েছে। মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে এ কয়দিনে ভাল পরিচয় হয়ে যায়। আমরা তার নিকট কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদেরকে পবিত্র এই তাবারুক দেখানোর জন্য অনেক মিনতী করি। কিন্তু তিনি আইন ও নীতির কারণে অপারগ ছিলেন। তিনিও আমাদেরকে এই সৌভাগ্যে ভূষিত করার জন্য আগ্রহী মনে হল। কিন্তু তিনি তা পুরা করতে পারছিলেন না। ঐ মসজিদেই পবিত্র কুরআনের অতি প্রাচীন হস্তলেখা একটি কপি রয়েছে। কুরআন শরীফটি কুফার হস্তলিপিতে লিখিত। এর উপরে লেখা একটি এবারত দ্বারা এটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে লিখিত বলে জানা যায়। তার এক কোণে 'হযরত আলীর হস্তলিপিতে' লিখিত রয়েছে 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ'।

মিম্বারের উপর সনুবর বৃক্ষের তৈরী অতি সুন্দর একটি রেহাল রাখা ছিল। তাতে হাতির দাঁতের কারুকার্য রয়েছে। ইমাম সাহেব বললেন ঃ এটি সুলতান আবদুল হামীদের হাতের তৈরী রেহাল। তার কাঠের কাজ করার খুব শখ ছিল। মসজিদের জন্য তিনি নিজের হাতে কয়েকটি জিনিস তৈরী করেছেন। সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানগণ মহলের অভ্যন্তরে মসজিদ নির্মাণ করতেন। কিন্তু এ মসজিদটি মহলের বাইরে হওয়ার কারণ এই হতে পারে যে, সুলতান আবদুল হামীদ এমন মসজিদে নামায পড়তে পছন্দ করেননি, যেখানে জনসাধারণ প্রবেশ করতে পারে না। সেজন্য মসজিদটি মহলের বাইরে রেখেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এই মহলে তিনদিন পর্যন্ত কনফারেন্স চলতে থাকে। আলোচনাটি মোটের উপর ফলপ্রসূ ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের যত তরজমা হয়েছে, সেগুলোর উপর বিভিন্ন দেশের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ পর্যালোচনামূলক বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছেন। কনফারেন্সের বিভিন্ন অধিবেশনে সেগুলো পাঠ করা হয়। প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠের পর সে

সম্পর্কে সমালোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়। তখন পবিত্র কুরআনের অনুবাদ বিষয়ে অনেক মৌলিক সমস্যাও আলোচিত হয়। সমালোচনার সময় বিভিন্ন বিষয়ে অধম লেখকেরও মতামত প্রকাশের সুযোগ হয়। সত্য কথা হল, এই আলোচনায় অংশগ্রহণের পর প্রথমবারের মত তীব্রভাবে এই ত্রুটির উপলব্ধি হয় যে, আমরা মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের অনুবাদের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজ কিভাবে অমুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আর তারা এই মাঠ দখল করে কিভাবে ইসলামের বিকৃতি সাধন করছে এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহ সংশয়ের জন্য পানি সিঞ্চন করছে। আলহামদুলিল্লাহ! বিশ্বের বহুল প্রচলিত ভাষাগুলোতে মুসলমানদের অনুবাদ কর্মও সাধারণের সামনে এসেছে। কিন্তু স্বল্প প্রচলিত ভাষাসমূহে বেশির ভাগ অমুসলিমদের তরজমাই মুদ্রিত হয়েছে। গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার এটি এমন একটি দিগন্ত, যেদিকে এখনও পর্যন্ত কোন মুসলিম সংগঠন বা সংস্থা যথার্থ মনোযোগ প্রদান করেনি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে দৃঢ়তা ও অবিচলতার সঙ্গে এই ফরজে কিফায়া পালন করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই কনফারেন্স দ্বারা এই মহতী কাজের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সর্বসম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং উপস্থিত সুধী মহলের অন্তরে এই কাজ সম্পাদনের এক স্পৃহা জন্ম নেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কনফারেন্সের সমাপ্তি অধিবেশনে ডঃ উগলুর অনুরোধে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে 'কালিমাতুল উফুদ' (প্রতিনিধি দলের বক্তব্য) হিসেবে অধম ভাষণ দান করি। তাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী এই কাজ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য কয়েকটি ইতিবাচক প্রস্তাবও পেশ করি, সেগুলো কনফারেন্সের সুপারিশের একটি অংশ হিসাবে গৃহিত হয়। সেখানে এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, এই কাজকে সম্মুখে অগ্রসর করানোর জন্য মারকাযুল আবহাছ এবং জামইয়্যাতুল দাওয়াতিল ইসলামিয়্যা মুসলমানদের বড় বড় আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন মুনাযযামাতুল মু'তামিরিল ইসলামী এবং রাবেতাতুল আলম আল ইসলামী প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে একে একটি সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালাবে।

বারবারুসা

কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে এতে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে দাওয়াতের ধারা চলতে থাকে। সেই সুবাদে শহরের বিভিন্ন অংশেও যাওয়া হয়। তার একটি দাওয়াত বসফরাসের তীরে অবস্থিত একটি হোটেলে ছিল। হোটেলের অদূরে সমুদ্র উপকূলে প্লাটফর্মের মত একটি জায়গা রয়েছে। তার একধারে একটি মাজারও রয়েছে। পথপ্রদর্শকগণ বললেন এটি তুরস্ক নৌবহরের প্রখ্যাত মুজাহিদ খায়রুদ্দীন বারবারুসার মাজার। এই প্লাটফর্মটি তার সময়ে বন্দর অঞ্চলরূপে ব্যবহৃত হত। খায়রুদ্দীন বারবারুসা (রহঃ) ইসলামী ইতিহাসের একজন খ্যাতনামা নাবিক। তার নৌবহর স্পেন পতনের পর সেখানকার বিপদগ্রস্ত মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে বের করে মরক্কো এবং আলজেরিয়া পৌঁছানোর অবিস্মরণীয় খিদমত আনজাম দেয়। রোম সাগর তার সৈন্যদের কেন্দ্র ছিল এবং সে কারণেই নৌযুদ্ধের ইতিহাসে বারবারুসার নাম চির অমর হয়ে আছে। ইকবাল মরহুম সম্ভবত সে যুগের আলোচনা করেই বলেছেন ঃ (কবিতা)

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی
بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی

অর্থ ঃ একদা এখানে মরুবাসীদের কোলাহল ছিল, সাগর ছিল যাদের জাহাজসমূহের ক্রীড়াঙ্গন।

ইসলামী ইতিহাসের গর্ব করার মত এই মুজাহিদের কবরে ফাতেহা পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ হয়।

বিভিন্ন ব্যস্ততা

দারুল উলূম করাচীর এক তুর্কী তালেবে ইলমের ভাই খায়রুল্লাহ দামারছী ইস্তাম্বুলে থাকেন। সেখানে তিনি ব্যবসা–বাণিজ্য ছাড়াও তাবলীগের কাজ করে থাকেন। অধমের আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি প্রায় প্রতিদিনই হোটেলে আসতেন। আমাকে কোন একসময় খানা খাওয়ানোর তার তীব্র বাসনা ছিল। সুতরাং কনফারেন্স চলাকালীন

সময়েই একদিন দুপুরে আমি তার ওখানে খানা খাই। এটি ইস্তাম্বুলের মধ্যম শ্রেণীর একটি মহল্লা। এখানে তুরস্কের সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। ইসলামের ভালোবাসায় তাদের হৃদয় পরিপূর্ণ দেখতে পাই। মহল্লার বেশির ভাগ মহিলাকে পর্দানশীন মনে হলো। পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা এবং রুচিসম্পন্ন জীবনধারা তুর্কী জাতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই মহল্লার লোকদের মধ্যে তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি।

খায়রুল্লাহ দামারছী সাহেব গুরুত্ব সহকারে তুরস্কের বিশেষ বিশেষ খাবার পাকানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাচীন তুর্কী রীতিতে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। বিছানার উপর বড় একটি ট্রেতে বিভিন্ন প্রকারের খাবার সাজিয়ে সেই ট্রে–এর পাশে বড় বড় বাটি রাখা আছে, যে যার ইচ্ছামত তাতে খাবার নিয়ে খায়। সবগুলো খানাই উন্নতমানের। সেগুলোর নাম মনে রাখার জন্য বিশেষ অনুশীলনের দরকার ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আমার হয়নি।

শুনতাম যে, কামাল আতাতুর্কের নগ্ন থাবার কবলে পড়ার পরও ইস্তাম্বুলে আরবী কিতাবসমূহের এত বড় ভাণ্ডার মজুদ রয়েছে যে, আরবী কিতাব থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় দুষ্প্রাপ্য কিতাবসমূহ নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়। অনেক বছর ধরে এই ধারা চালু থাকে এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যানুরাগীরা কার্টুন ভরে ভরে এখান থেকে কিতাব নিয়ে যেতে থাকে। বর্তমানে যদিও ক্রমশঃ তার সেই প্রবাহ শেষ হয়ে গেছে, তবুও কিতাবের পুরাতন ঝুড়িতে এখনও কাজের জিনিস পাওয়া যায়। সুতরাং আমি খায়রুল্লাহ দামারছী সাহেবকে প্রাচীন কোন গ্রন্থ বিক্রেতার নিকট আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

আমরা ইস্তাম্বুলের একটি পুরাতন বাজারে যাই। বাজারটি কন্সট্যান্টিনোপলের সেই প্রাচীন নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত, কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের কথায় যার আলোচনা করেছি। বাজারের একটি মসজিদে আমরা আসর নামায আদায় করি। মসজিদ থেকে বের হয়ে কিতাবের বিভিন্ন দোকানে যাই, কিন্তু সেখানে গিয়ে অনুমান হয় যে, আরবী কিতাবসমূহের ঢলের সেই প্রবাহ এখন আর অবশিষ্ট নেই।

এখন কোন কোন গ্রন্থাগারে পুরাতন কিছু কিতাব রয়েছে, কিন্তু তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে প্রায় ঘন্টা খানেক খোঁজাখুজি করার পরও চার পাঁচটি কিতাবের বেশি ক্রয় করতে পারিনি।

এখানকার একটি চৌরাস্তায় নির্মিত একটি ভাস্কর্যের দিকে ইশারা করে খায়রুল্লাহ সাহেব বললেন এটি ইবরাহীম মুতাফাররিকার ভাস্কর্য। ইবরাহীম মুতাফাররিকা ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে (দ্বাদশ হিজরী শতাব্দী) প্রেস আবিষ্কার করেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) জামে মসজিদ

কনফারেন্স শেষ হওয়ার পরের দিন কনফারেন্সের ব্যবস্থাপকগণ ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের জন্য একটি সম্মিলিত প্রোগ্রাম করেন। কিন্তু খায়রুল্লাহ দামারছী সাহেব এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, আমি ঐ দলে আবদ্ধ না হয়ে বরং দুদিন তার সঙ্গে অতিবাহিত করি। কারণ, এমন অনেক স্থান রয়েছে যেগুলো এছাড়া দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি ১৪ই রজব সকাল বেলা তার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে হোটেলে আসেন। ডঃ ইউসুফ কালীজও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক থাকার কারণে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য হোটেলে চলে আসেন। আমাদের বের হওয়ার পথে হোটেলের লবিতে ডঃ ইরভিং (Irveng) এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি আমেরিকান বংশোদ্ভূত একজন প্রখ্যাত নওমুসলিম। ইংরেজীতে তিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেছেন এবং এখন হাদীসের কিতাবসমূহেরও অনুবাদ করছেন। কনফারেন্স চলাকালীন সময়েও তার সঙ্গে সাক্ষাত হতে থাকে। কয়েকবার তিনি পাকিস্তানেও এসেছেন। তিনি আমাদের পৃথক প্রোগ্রামের কথা শুনে অন্যদের সঙ্গে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এভাবে আমরা পাঁচজনের একটি জামাত হয়ে যাই।

আমাদের ইচ্ছা ছিল সর্বপ্রথম হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) জামে মসজিদে যাওয়ার। এই মসজিদের পাশেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এই মেজবানের মাযারও রয়েছে। এজন্য ইস্তাম্বুলের মধ্যে সেখানে যাওয়ার আগ্রহই ছিল আমাদের সর্বাধিক।

জায়গাটি হোটেল থেকে অনেক দূরে। কারণ, আমরা অবস্থান করছিলাম বসফরাসের তীরে আর এই মাযার অবস্থিত ইস্তাম্বুলের একেবারে দক্ষিণ–পূর্ব অংশে। সেখানে যাওয়ার পথে কন্সট্যান্টিনোপলের সেই প্রাচীন নগর প্রাচীরও নিকট থেকে দেখতে পাই। যাকে একসময় অপরাজেয় মনে করা হত। আর এখন তার ভগ্নাবশেষই অতীতের জাঁকজমকপূর্ণ উপাখ্যান শুনিয়ে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ পথ চলার পর আমরা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)এর পবিত্র মাযারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি।

কোন মুসলমানের নিকট হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) এর পরিচয় দানের প্রয়োজন নেই। হযরত আবু আইয়ুবের নাম খালেদ বিন যায়েদ। তিনি পবিত্র মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক। শুরুতেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনিই সেই মহাসৌভাগ্যবান সাহাবী, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর এক মাস কাল তাঁর মেহমানদারী করার মর্যাদা লাভ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন 'কাছওয়া' তাঁর গৃহের সম্মুখে এসেই থেমে যায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছায় তিনি তাঁকে নিচের তলায় থাকতে দেন। আর নিজে পরিবারসহ উপরের কক্ষে অবস্থান করেন। একবার উপরের কক্ষে পানি পড়ে গেলে তাঁরা আশংকা করেন যে, এই পানি চুয়ে নিচে পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হতে পারে। তাই তাঁরা চাদর দ্বারা সেই পানি শুকিয়ে ফেলেন। প্রত্যেকটি গাযওয়াতে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁকে পবিত্র মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরে তিনি জেহাদের আগ্রহে হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট চলে যান এবং খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রাযিঃ)এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) স্বীয় পুত্র ইয়াযীদের নেতৃত্বে কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণের জন্য প্রথম যে বাহিনী প্রেরণ করেন, তার মধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)ও ছিলেন। এখানকার

অবরোধ দীর্ঘ হয়। তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইয়াযীদ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট যান। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন ঃ কোন কাজ থাকলে নির্দেশ করুন। উত্তরে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) বলেন ঃ

"আমার একটি মাত্র বাসনা রয়েছে, তা হলো, আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ শত্রুভূমিতে যতদূর সম্ভব ভিতরে নিয়ে যাবে এবং সেখানে নিয়ে দাফন করবে।"

এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইয়াযীদ তাঁর ওসীয়ত পূরণ করেন এবং কন্সট্যান্টিনোপলের নগর প্রাচীরের নিকট তাঁকে দাফন করেন।

ইতিহাসে আছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের পর গুরুত্ব সহকারে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)এর কবর খোঁজ করেন। তখন একজন বুযুর্গের সহযোগিতায় এখানে সেই কবর পেয়ে যান। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ 'জামে আবি আইয়ুব' নামে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন থেকে এ স্থান সাধারণ ও বিশিষ্ট নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের যিয়ারত কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার পুরো মহল্লাটিকেই 'আবু আইয়ুব' বলা হয়। পবিত্র মাযারে লোকেরা বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করে থাকে।

মহান এই সাহাবী আল্লাহ পাক যাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীনের মেহমানদারী করার মর্যাদায় ভূষিত করেন, স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দূর দেশের এই মাটিতে আখেরাতের পথে যাত্রা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্তের একমাত্র বাসনা ছিল যে, আল্লাহর কালেমাকে নিয়ে শত্রুর ভূখণ্ডে যতদূর যাওয়া সম্ভব যেতে থাকবেন। মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তার কবরস্থান সম্পর্কে কেউ জানত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কন্সট্যান্টিনোপল বিজেতা তিনিই ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই এই ভূখণ্ডে প্রথমবার ইসলামের কালেমা পৌছে। তাঁর উসিলাতেই এই ভূখণ্ড রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর সমাধিস্থল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

উসমানী সুলতানগণ সর্বদা আবু আইয়ুব জামে মসজিদকেই

ইস্তাম্বুলের পবিত্রতম স্থান বলে মনে করতেন। এই মসজিদেই প্রত্যেক নতুন সুলতানের মুকুট পরানোর ধারা চালু থাকে। এ কাজের জন্য এখানে একটি স্থান নির্ধারিত ছিল। মুকুট পরানোর পরিবর্তে সুলতান উসমান খানের তরবারী নতুন সুলতানের কোমরে বেঁধে দিয়ে মুকুট পরানোর প্রথা পালন করা হত।

আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) জামে মসজিদের বাইরে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা রয়েছে। সেখানে অনেক কবুতর থাকে। লোকেরা তাদেরকে দানা দিয়ে থাকে। আঙ্গিনার ডান দিকে একটি চত্বরে বড় বড় দুটি চানার বৃক্ষ রয়েছে। বৃক্ষ দুটি যে অনেক পুরাতন তা দেখেই বোঝা যায়। লোকেরা বলে যে, এই বৃক্ষ সাহাবায়ে কেরামের যুগের। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ফাতেহে নামায গাহী

খাইরুল্লাহ সাহেব আবু আইয়ুব (রাযিঃ) জামে মসজিদ থেকে আমাদেরকে অপর একটি প্রাচীন এলাকায় নিয়ে যান। জায়গাটি প্রায় বসতীশূন্য। এখানে কিছু ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। পুরাতন কিছু ঘরও রয়েছে। তাতে কিছু লোক বসবাস করে। জায়গাটির নাম 'ফাতেহে নামায গাহী'। প্রসিদ্ধ আছে যে, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের দিন এখানে দু' রাকাত নামায পড়ে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত আক্রমণ করেন। এখানে পুরাতন একটি স্তম্ভ রয়েছে। তাতে কিছু লিখিত আছে। তা পাঠ করা যায় না। যা হোক এটি সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের নামাযের স্থান বলে মানুষ বলে থাকে। একসময় এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। এখন তা ভেঙ্গেচুরে বিরান পড়ে আছে।

কাসেম পাশা– স্থলপথে জাহাজ চালানোর স্থান

এখান থেকে আমরা 'কাসেম পাশা' যাই। এটি 'গোল্ডেন হর্ন' এর সেই তীর, যেখান দিয়ে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তার জাহাজগুলো স্থলপথ অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রে নামিয়ে ছিলেন। স্থানটি আজো ছোট একটি বন্দররূপে ব্যবহার করা হয়। এখানে তুর্কী নৌবাহিনীর একটি চৌকিও রয়েছে। আমরা এখানে গাড়ী থেকে নামলাম। যেদিক থেকে

জাহাজ এনে সমুদ্রে নামানো হয়েছিল, আমরা সেদিকে তাকালাম। ঘটনাটি ইতিহাস গ্রন্থে অনেকবারই পড়েছিলাম। বিস্ময়ও জেগেছিল, কিন্তু এখানে এসে আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কারণ, এখানে দাঁড়িয়ে বসফরাসের দিকে তাকিয়ে পথে অনেকগুলো উঁচু উঁচু পাহাড় দেখতে পেলাম। পাহাড়গুলো প্রস্থে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমতল স্থলপথে জাহাজ নিয়ে যাওয়াও রীতিমত এক বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু এই পাহাড়গুলোর উপর জাহাজ উঠিয়ে তা নামিয়ে আনা এমন বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এই অঞ্চল দেখে কোন লোকের তা কল্পনা করতেও ঘাম ঝরাতে হয়। এই পাহাড়গুলো দেখার পর পাহাড়ের উপর দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা একটি লোক কিরূপে করল সেটিই বড় বিস্ময়ের কথা।

আসল কথা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দা দ্বারা কোন কাজ নিতে চাইলে তাকে সে সাহস এবং দৃঢ় সংকল্প দান করেন। দশ মাইল দূরত্বের মারাত্মক অসমতল এই পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা মস্তিষ্কে আসা, তা বাস্তবায়নের সাহস সৃষ্টি হওয়া এবং এক রাতে এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা নিঃসন্দেহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মোজেযা ছিল, যা তাঁর এক উম্মতের হাতে আল্লাহ পাক প্রকাশ করেছেন।

এখানে দাঁড়িয়ে নিকট থেকে গোল্ডেন হর্ন দেখলাম। দীর্ঘ উপসাগরটি বসফরাস থেকে পূর্বের স্থলের দিকে বের হয়ে এসেছে। এই উপসাগরের আকৃতি শিং এর মত। কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীর থেকে একজন লোক সূর্য উদয়কালে এর দিকে তাকায়। সূর্যের কিরণ থাকায় এর রং সোনালী দেখতে পায়। তাই সে বলে উঠে এটা তো গোল্ডেন হর্ন (সোনালী শিং)। তখন থেকে তার নাম গোল্ডেন হর্ন (সোনালী শিং) হয়ে যায়। একে আরবীতে 'আল কারনুযযাহাবী' এবং ফারসীতে 'শাখে যিররী' বলা হয়। ইস্তাম্বুল বন্দর এই উপসাগরেই অবস্থিত। শহরের উত্তরাংশের এবং দক্ষিণাংশের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখাও এটিই। এক অংশ থেকে অপর অংশে যাওয়ার জন্য এর উপর কয়েকটি পুল নির্মাণ করা হয়েছে। পুলগুলোতে সবসময় ট্রাফিক জ্যাম লেগেই থাকে।

গালাতা টাওয়ার

এখান থেকে আমরা ইস্তাম্বুলের প্রাচীনতম টাওয়ার 'গালাতা' যাই। এটি অতি প্রাচীন একটি টাওয়ার। এর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, ৫০৭ খৃষ্টাব্দে (প্রায় ১৪৮০ বছর পূর্বে) রোমান সরকার জাহাজের পথ নির্দেশের জন্য বাতিঘররূপে এটি নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ একে সে যুগের সর্বোচ্চ টাওয়ার মনে করা হত। পরে এর বিস্তৃতি ও মেরামতের কাজ হতে থাকে। এখনো বাহির থেকে তার প্রাচীনত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এটি এখনো পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য। মুসলমানেরা কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের পূর্বে টাওয়ারটি শহরের বাহিরে গোল্ডেন হর্ন (সোনালী শিং) এর উত্তর উপকূলে ছিল। এখানে ইউরোপের বণিকরা বসবাস করত। তখন এই বসতির নাম ছিল গালাতা, এর নামেই টাওয়ারের নামকরণ করা হয়।

এটি দশতলা বিশিষ্ট একটি টাওয়ার। উপরে যাওয়ার জন্য এখন লিফট লাগানো হয়েছে। সাততলা পর্যন্ত লিফট যায়। উপরের তিন তলা সিঁড়ি বেয়ে অতিক্রম করতে হয়। এখান থেকে ইস্তাম্বুলের দৃশ্য বড় মনোরম মনে হয়। লিফট যেখানে গিয়ে শেষ হয়, সেখানে মাঝারি ধরনের একটি কক্ষ রয়েছে। তাতে কিছু প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। ঐ কক্ষের একটি দেওয়ালে চর্ম নির্মিত দুটি পাখা ঝুলানো আছে। তার পাশে তুর্কী এবং ইংরেজী ভাষায় এর পরিচিতিমূলক কিছু কথা লেখা আছে। যার মর্ম এই, এই পাখা উদ্যোমী মুসলমান হাযাফিন আহমাদ কর্তৃক নির্মিত। তিনি এই পাখা দ্বারা সতের শ' খৃষ্টাব্দে আকাশে উড়ার সফল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি চতুর্থ সুলতান মুরাদের শাসনকালে (১৬২৩–১৬৪০) গালাতা টাওয়ার থেকে ঐ পাখা লাগিয়ে বসফরাসের উপর দিয়ে উড়ে বসফরাসের এশিয়ান উপকূল ইস্কোদার হয়ে ইস্কোতার নামক স্থান পর্যন্ত চলে যান। প্রায় আট মাইল পথ তিনি এভাবে অতিক্রম করেন[১]।

টীকা ঃ ১. পাখা লাগিয়ে উড়ার অনেক ঘটনাই মানব ইতিহাসে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সম্ভবতঃ আরবী ভাষার খ্যাতনামা অভিধানবেত্তা ইসমাইল বিন হাম্মাদ জাওহারী সর্বপ্রথম এ প্রয়াস চালান। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সোলাইমানিয়া জামে মসজিদ

এখান থেকে আমরা ইস্তাম্বুলের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক মসজিদ 'জামে সুলাইমানীয়া' দেখতে যাই। বিস্তৃতির দিক থেকে মসজিদটি ইস্তাম্বুলের সর্ববৃহৎ মসজিদ এবং স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি মসজিদের অন্যতম। প্রসিদ্ধ উসমানী খলীফা 'সোলাইমানে আযম'-এর যুগে এটি নির্মাণ করা হয়। সময়টি ছিল তুর্কী খেলাফতের চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্থানকাল। সে যুগের জগৎবিখ্যাত স্থপতি 'যীনান' এর নির্মাণ কাজে নির্মাণ শিল্পের সকল কুশলতা প্রয়োগ করেন। এই সেই যীনান, যার নাম পুরো প্রকৌশলের ময়দানে আজও প্রসিদ্ধ ও খ্যাত। সোলাইমানে আযমের নির্দেশে যীনান দশম হিজরী শতাব্দীতে (ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দী) এই মসজিদ নির্মাণ করেন। শাইখুল ইসলাম আবুস সাউদ আফেন্দী (রহঃ) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মসজিদের প্রধান ফটক সংলগ্ন ডান দিকে উযূর সুব্যবস্থা রয়েছে। যোহর নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমরা এখানে উযূ করে এই মসজিদেই যোহর নামায আদায় করি।

বিশ্বের নানা প্রকারের পাথরে সজ্জিত এই মসজিদের বিস্তৃত একটি হল কক্ষ রয়েছে। এর প্রত্যেক দিকে স্থাপত্য শিল্পের মনমুগ্ধকর কারুকার্য জ্বলজ্বল করছে। কথিত আছে যে, এই মসজিদে ব্যবহৃত পাথর বহনের কাজে পাথরের মূল্য থেকেও অধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে। বেশির ভাগ পাথর পনের শ' কেজি ওজনের। গরুর গাড়ীতে করে সেগুলো এখানে আনা হয়। অধিক ভারী পাথরগুলো দশ জোড়া গরুর গাড়ী ব্যবহার করে বহন করে আনা হয়।

মসজিদের মেম্বার এবং মেহরাব সুলতান আহমাদ মসজিদের মতই জাঁকজমকপূর্ণ ও কারুকার্য খচিত। মসজিদের হলকক্ষ ৬৯ মিটার দীর্ঘ এবং ৬৩ মিটার চওড়া। ১৩৮টি জানালা। হলকক্ষের জায়গায় জায়গায় দশ ফুট লম্বা এবং তিন ফুট মোটা বাতিসমূহ আজও বসান আছে। বাতি দ্বারা রাত্রিতে আলো জ্বালানো হত। বাতি থেকে নির্গত ধোঁয়ায় প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকায় তার উপর সুন্দর সুন্দর চিমনী তৈরী করা হয়েছে। বাতির ধোঁয়া চিমনী টেনে নিত। চিমনীর ধোঁয়া যেন

অনর্থক নষ্ট না হয়, সেজন্য এর কালি দ্বারা লেখার কালি তৈরী করা হত।

ইতিহাসে আছে, মসজিদের নির্মাণ কাজ চলাকালে কোন একটি জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকে। ইরান সম্রাট তাহমাছাপ বিষয়টি অবগত হয়ে একজন দূতের মাধ্যমে সোলাইমানে আযমের নিকট বিরাট অংকের মুদ্রা এবং অতি মূল্যবান কিছু রত্ন পাঠিয়ে দেন। সাথে সংবাদ পাঠান যে, এই মসজিদের নির্মাণ কাজে আমরা অংশ নিতে চাই। তাই এই মুদ্রা ও রত্ন বিক্রি করে এর মূল্য মসজিদের কাজে লাগাবেন।

এগুলো নিয়ে দূত সোলাইমানে আযমের নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তিনি সে সব মুদ্রা মিসকিনদের মধ্যে বিতরণের জন্য নিজের লোকের হাতে দিয়ে দেন। তারপর দূতকে বলেন ঃ

"তোমরা তো নামায পড়ো না, তোমাদের অর্থ কিরূপে মসজিদে ব্যবহার করবো।"

রত্নগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন ঃ

"আমরা মসজিদের মিনারের নির্মাণ কাজে বিভিন্ন প্রকার পাথর ব্যবহার করেছি, রত্নগুলোও পাথর হিসেবে মিনারের নির্মাণ কাজে ব্যবহার কর।"

দূত এ কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু সোলাইমানে আযম তার সিদ্ধান্ত অনুপাতেই কাজ করেন।

আমাদের পথপ্রদর্শক খাইরুল্লাহ দামারছী সাহেব সমকালীন আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনালেন। ঘটনাটি এই সোলাইমানিয়া জামে মসজিদ নির্মাণকালে ইউরোপের একটি দেশের (সম্ভবতঃ ইটালী) গীর্জা সে দেশের লাল মর্মর পাথরের একটি সুন্দর সিল (পাথর) উপঢৌকন পাঠিয়ে তা মসজিদের মেহরাবে লাগানোর আবেদন জানায়। সিল পৌঁছলে স্থপতি যীনান সোলাইমানে আযমকে বলেন যে, এই সিল মেহরাবে লাগানো আমি ভাল মনে করছি না। আপনি অনুমতি দিলে আমি কোন দরজার চৌকাঠে এটি লাগিয়ে দেই। সোলাইমানে আযম তার মতটি পছন্দ করেন। তখন পাথরটি চৌকাঠে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

যীনানের সন্দেহ হয় যে, এই পাথর প্রেরণে গীর্জাওয়ালাদের কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তাই সে একদিন পরীক্ষামূলকভাবে এতে কি আছে তা দেখার জন্য বিশেষ এক মশলা দ্বারা পাথরটি ঘঁষে দেখেন। ঘঁষার পর পাথরের মধ্যে কালো রঙ্গের একটি ক্রুশ দেখা গেল। পাথরটি আজো দরজার চৌকাঠে বসানো আছে। সেই ক্রুশের চিহ্ন এখনো দৃষ্টিগোচর হয়। এখন তা কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও বেশ পরিস্কার দেখা যায়। যা গীর্জাওয়ালাদের দূরভিসন্ধি ও প্রতারণার এবং মসজিদের স্থপতিদের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহন করছে।

মসজিদের বাইরে একটি বেষ্টনীর মধ্যে অনেকগুলো কবর রয়েছে। তার একটি কবর সোলাইমানে আযমের। আমরা সেই মাযারও যিয়ারত করি।

সোলাইমানে আযম

সোলাইমানে আযমের শাসনকালে উসমানী সালতানাতের ইতিহাসে সর্বাধিক উজ্জ্বল যুগ। এটি খেলাফতে উসমানিয়ার উত্থানের সেই যুগ, যার প্রান্ত গিয়ে পতনের সাথে মিলিত হয়। সোলাইমানে আযম ৯২৬ হিজরী থেকে ৯৭৪ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর যেই প্রতাপ ও শান–শওকতের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তার দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে বরং বিশ্ব ইতিহাসে কমই দৃষ্টিগোচর হয়। উসমানী খেলাফত সে যুগে স্বীয় বিস্তৃতি, শক্তি ও সচ্ছলতায় চরমোৎকর্ষে পৌঁছেছিল। ইসলামের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এত বিস্তৃত হুকুমাত আর কেউ লাভ করেনি। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের বিশাল ভূখণ্ড তার শাসনাধীন ছিল। হাঙ্গেরী থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিপত্তির ঝাণ্ডা উড়ছিল।

সোলাইমানে আযম নিজেও অতি ন্যায়বিচারক ও নীতিবান শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ছিল (দু' একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ছাড়া) ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের যুগ। তিনি (সম্ভবতঃ প্রথমবার) তাঁর সালতানাতের জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন করেন। এজন্য তাঁকে 'সোলাইমানে কানূনী'ও বলা হয়। তাঁর ন্যায়বিচারের কারণে খৃষ্টান

অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বদেশ ত্যাগ করে তাঁর দেশে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। রাজ্যের নিয়ম শৃংখলা এবং ন্যায়বিচারের বিষয়ে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, ঘুষ ও জুলুমের দায়ে তিনি তাঁর জামাতা ফরহাদ পাশাকে একটি প্রদেশের গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। পরে ফরহাদ পাশার স্ত্রী এবং সোলাইমানের মা'র অনেক অনুরোধের পর তাকে সে পদে পুনর্বহাল করেন। কিন্তু পুনরায় দূর্নীতি শুরু করলে তাকে বরখাস্ত করেন এবং হত্যা করেন।

নির্মাণ শিল্পী যীনান

সোলাইমানে আযমের মাযারের কাছেই সোলাইমানীয়া জামে মসজিদের রাজমিস্ত্রী যীনানের কবরও রয়েছে। এই যীনানকেই নির্মাণ শিল্পের প্রবর্তক মনে করা হয়। ইতিহাসে পাওয়া যায়, তিনি তার জীবনে একশত ছত্রিশটি মসজিদ, সাতান্নটি মাদ্রাসা, সতেরটি মকতব, বাইশটি কবরস্থান, বাইশটি বাবুর্চিখানা, তিনটি হাসপাতাল, চৌদ্দটি পুল, বিশটি মোসাফেরখানা, পঁয়ত্রিশটি মহল, একচল্লিশটি গোসলখানা এবং আটটি গুদাম ঘর নির্মাণ করেন। তার মৃত্যুর পর তুরস্কে তিনশত ষাটটি ভবন তার শিল্পকর্মের স্মৃতি হয়ে আছে। এসব স্মৃতির মধ্যে সোলাইমানীয়া জামে মসজিদ তার সর্ববৃহৎ রাজকর্ম। এই মসজিদ সম্পর্কে বার্নার্ড লুইস লেখেন ঃ

"সোলাইমানীয়া জামে মসজিদ যীনানের সুন্দরতম শৈল্পিক রাজকর্ম। সকল ঐতিহাসিকের মতে যীনান হলেন একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বা রাজমিস্ত্রী।"

সোলাইমানিয়া গ্রন্থাগার

জামে মসজিদের কেন্দ্রীয় দরজার সম্মুখে আর একটি ইমারত রয়েছে। উসমানী খেলাফতকালে ইমারতটি বড় একটি মাদ্রাসারূপে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এটিকে গ্রন্থাগার বানানো হয়েছে। গ্রন্থাগারটি ইস্তাম্বুলের বৃহত্তম গ্রন্থাগারসমূহের অন্যতম। ইস্তাম্বুল কয়েক শতাব্দীকাল আলমে ইসলামের কেন্দ্রস্থলরূপে বিদ্যমান থাকে, তাই এর

গ্রন্থাগারসমূহকেও আলমে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাগাররূপে গণ্য করা হত। তাছাড়া বর্তমানে সোলাইমানীয়া গ্রন্থাগারের সঙ্গে ছোট ছোট অনেকগুলো গ্রন্থাগার একীভূত করা হয়েছে। এতে করে এর পরিধি আরো অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে।

আমরা গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করি। আফসোস রয়ে গেল, এখান থেকে জ্ঞান আহরণের সময় হল না। এখানে এমন অনেক দুর্লভ গ্রন্থের হস্তলিপি কপি রয়েছে, যেগুলোর শুধু নামই আমরা শুনেছি, কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। এমন অনেক হস্তলিপি গ্রন্থও দেখলাম যেগুলোর নামও কখনও শুনিনি। একজন তালেবে ইলমের জন্য এ জায়গা এক আধ ঘন্টা ভ্রমণের জন্য নয়, বরং মাসের পর মাস জ্ঞান আহরণের জন্য ব্যয় করা দরকার। আমি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখছি, তাই এখানে বিদ্যমান মুসলিম শরীফের অমুদ্রিত ভাষ্যগ্রন্থসমূহের ফটোকপি নেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু ভিনদেশীদেরকে এর জন্য অনেক নিয়ম পালন করতে হয়, যেগুলো পুরা করা এখন সম্ভব নয় বলে আমি ডঃ ইউসুফ কালীজের নিকট এগুলোর ফটোকপি আমার নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। সুতরাং তিনি এর মধ্য থেকে কয়েকটি কিতাব ধারাবাহিকভাবে অধমের নিকট পাঠাতে থাকেন।

বন্ধ বাজার (কুবালী জারেশী)

সোলাইমানীয়া জামে মসজিদ থেকে আমরা হোটেলে ফিরে যাই। আসর নামাযান্তে খাইরুল্লাহ দামারছী সাহেব আমাকে ইস্তাম্বুলের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাজার 'কুবালী জারেশী' নিয়ে যায়। এটি সুন্দর ছাদবিশিষ্ট একটি বাজার। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ এটি নির্মাণ করেন। সম্পূর্ণ বাজারের উপর কারুকার্য খচিত মেহরাবের আকৃতির সুন্দর পাকা ছাদ রয়েছে। এ কারণেই একে বন্ধ বাজার বলা হয়। প্রাচীনকালের প্রচলিত ছাদবিশিষ্ট বাজারের মধ্যে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ছাড়াও সৌদী আরব, শাম এবং মিসর প্রভৃতি দেশের বাজার আমি দেখেছি। কিন্তু নিয়ম শৃংখলা, মজবুত গঠন এবং ভবনের সৌন্দর্যের দিক থেকে এই বাজারটি অন্য সব বাজারের উর্ধ্বে। বাজারটির একটি প্রধান ফটক রয়েছে, তার মধ্যে প্রবেশ

করলে অনেক দূর পর্যন্ত ছাদ এবং দু' সারি বিশিষ্ট দোকানের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। বাজারটিতে ৩২১টি দোকান, ছয়টি গোসলখানা, পাঁচটি মসজিদ এবং পঁয়ষট্টিটি গলি আছে। প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস এখানে পাওয়া যায়। তুরস্কের তৈরী সামগ্রীসমূহের প্রধান কেন্দ্র এটি। মূল্যও যথোপযুক্ত। এখানে সামান্য কেনাকাটা করে বেশ ভালই লাগল।

তাহ্ফীযুল কুরআন মাদরাসা

সে দিনই এশার পর শায়খ আমীন সিরাজ সাহেবের সঙ্গে ইস্তাম্বুলের একটি মাদ্রাসাতে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান ও রাত্রের খাবার খাওয়ারও কথা ছিল। আমি এশার নামায শায়খ আমীন সিরাজ সাহেবের সাথে পড়ে ঐ মাদ্রাসায় চলে যাই। হিফযখানা নাম শুনলেই ছোট একটি মক্তব বলে ধারণা হয়। কিন্তু মাদ্রাসাটি দেখে অন্তর আনন্দে ভরে গেল। পাঁচতলা বিশিষ্ট মাদ্রাসা ভবন। প্রত্যেক তলায় শ্রেণীকক্ষ এবং ছাত্রাবাস রয়েছে। আবাসিক ছাত্র ছয়শত। এছাড়া অনাবাসিক ছাত্রও রয়েছে। পবিত্র কুরআন হিফয করার সাথে সাথে প্রাথমিক আরবী এবং দ্বীনিয়াতও শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক উস্তাদের বেশভূষা ও চাল-চলনসহ সর্বক্ষেত্রে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের রং উদ্ভাসিত। তাঁদের সঙ্গে আরবীতে কথা হল। তাঁরা আরবীতে মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁদের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে, তাঁরা নিখাদ দ্বীন এবং তাবলীগের স্পৃহা নিয়ে মাদ্রাসার খেদমত করছেন।

মাশাআল্লাহ। শিক্ষার মানও অনেক উন্নত মনে হল। আমাদেরকে প্রশস্ত একটি হলকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। হল কক্ষের মেঝের উপর গালিচা বিছানো ছিল। প্রায় একশ' জন বালক (১০ থেকে ১৭ বছরের বয়সের) বিছানার উপর সুন্দর টুল সামনে নিয়ে সুশৃংখলভাবে ও আদবের সাথে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতরত ছিল। একজন উস্তাদ কেন্দ্রীয় আসনে উপবিষ্ট। উস্তাদ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। ছাত্ররা পূর্ববৎ তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকে। আমরা গিয়ে বসলাম। উস্তাদ অভ্যর্থনাসূচক কিছু কথা বলার পর বললেন ঃ এ সকল ছাত্র কুরআন হিফয শেষ করে 'দাওর' করছে। আপনি এদের যার থেকে

ইচ্ছা এবং পবিত্র কুরআনের যেখান থেকে ইচ্ছা তেলাওয়াত শুনুন।

আমি একশ' ছেলের মধ্য থেকে বিভিন্ন জায়গায় বসা প্রায় বিশজন ছেলেকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে তেলাওয়াত করতে বললাম। তাদের তেলাওয়াত শুনে আমি শুধু অবাকই হলাম না, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ঐ বিশজন ছাত্রের (যাদেরকে আমি নিজেই নির্বাচন করি) প্রত্যেকে কমপক্ষে এক রুকু করে তেলাওয়াত করে শুনিয়েছে। কারো তেলাওয়াতেই একটুও ভুল হয়নি। এদিক থেকে আমি কোন আয়াতের প্রথম দু' তিন শব্দ পড়তেই ওদিক থেকে সে তেলাওয়াত শুরু করত। মুখস্তের ভুল তো দূরের কথা কোন ছাত্রের মাখরাজ এবং তাজবীদের কোন ভুলও আমি ধরতে সক্ষম হইনি। আর এমন মন মাতানো উচ্চারণ ও স্বরে তারা পড়ছিল যে, মন চাচ্ছিল সারারাত তেলাওয়াত চলতে থাক।

ছাত্রদের এই পরীক্ষা পর্ব শেষ হওয়ার পর উস্তাদের নির্দেশে সকলে সমকণ্ঠে পবিত্র কুরআনের স্তূতি সম্বলিত একটি উৎকৃষ্টমানের গজল অতি মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে গেয়ে শুনাল। গজলের প্রথম চরণগুলো ছাত্রদের যাদুময়ী ধ্বনিতে আমার কানে আজো গুঞ্জরিত হচ্ছে—

غرد ياشبل الايمان غرد واصدع بالقران

فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان

অর্থ ঃ

হে ঈমানের সিংহশাবক ! গজল গাও,
বজ্রনিনাদে কুরআনের বাণীর ঘোষণা দাও।
কুরআনে আছে সত্য ও নূরের বাণী,
কুরআনে আছে মুক্তা আর মানিক খনি।

মাদ্রাসাটি ধর্মীয় মাদ্রাসাসমূহের একটি সুসংহত পরিকল্পনার অঙ্গ বলে জানতে পারলাম। শুধুমাত্র ইস্তাম্বুল শহরে এই জাতীয় দুই শত দশটি মাদ্রাসা রয়েছে। সারাদেশে রয়েছে পাঁচ হাজার মাদ্রাসা, এই পাঁচ হাজার মাদ্রাসায় রেজিষ্ট্রিকৃত ছাত্রের সংখ্যা ছয় লক্ষ। শুধু ইস্তাম্বুলে আবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছয় হাজার। এভাবে এই মাদ্রাসাগুলো নতুন

প্রজন্মকে পবিত্র কুরআন এবং দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার বিরাট বড় খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। সব কয়টি মাদ্রাসা সরকার অনুমোদিত এবং এতে শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা আছে।

আমি মাদ্রাসা দেখছিলাম, বিস্তারিত শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, এই সেই দেশ, যে দেশে কামাল আতাতুর্ক পবিত্র কুরআন শাইখুল ইসলামের মস্তকে ছুড়ে মেরেছিল। যে দেশে আরবী ভাষায় কথা বলা তো দূরের কথা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রদান করা এবং আরবী ভাষায় আযান দেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। কামাল আতাতুর্ক 'হ্যাট ওয়ার' এর সময় ভেবেছিল, এই জাতিকে তুর্কী টুপির পরিবর্তে হ্যাট পরিয়ে তাদের মস্তিষ্ক পাল্টে ফেলবে। আজ সেই জাতিরই নতুন প্রজন্মের ছয় লক্ষ সন্তান আরবী টুপি পরিধান করে আপন বক্ষে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করছে। আরবীতে তার প্রশস্তি-গজল গাচ্ছে। তারা তাদের পূর্ণ অস্তিত্বই মহাপবিত্র এই কিতাবের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে।

তুরস্কে এখনো ইসলামী ইলমের পূর্ণাঙ্গ কোন মাদ্রাসা নেই। তবে হিফযুল কুরআনের এসব মাদ্রাসা, যেগুলো আরবী ভাষার সাথেও ভাল সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়—বিরাট বড় খেদমত করে যাচ্ছে। এই ধারাকে আগে বাড়ানোর জন্য উলামায়ে কেরাম অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এবং সুকৌশলে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শহরের অন্যান্য আলেমদেরকেও খানার দাওয়াত করা হয়েছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে তুরস্কের দ্বীনি হালত এবং তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। এ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল শহরের আধুনিক এলাকার এবং আধুনিক তুরস্কের একদিকই আমার সম্মুখে বেশি ছিল। সে দিকটি ছিল পাশ্চাত্যবাদে নিমজ্জিত। কিন্তু তার অপর দিক, যা সিংহভাগ তুর্কী জাতির আসল দিক, যা তাদের অতীত ও বর্তমানের গভীরে প্রবেশ করে আছে। হাজার চেষ্টার পরও যা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি—পূর্ণ দীপ্তি সহকারে আজ তা আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়। এর আনন্দ আমার মন-মগজকে দীর্ঘক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে।

শেষ দিন

পরের দিন ছিল আমার ইস্তাম্বুলে অবস্থানের শেষ দিন। মাগরিবের ওয়াক্তে করাচীর পথে আমাকে যাত্রা করতে হবে। আজকেও খাইরুল্লাহ দামারছী সাহেবের সঙ্গে কয়েক জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। ইস্তাম্বুলের এশিয়া অংশে এখনো যাওয়া হয়নি। বিশেষ করে সেখানকার মরমরা ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে।

খাইরুল্লাহ দামারছী সাহেব তার এক বন্ধুর সঙ্গে সকাল নয়টায় হোটেলে চলে আসেন। আমি পুনরায় তার সাথে যাত্রা করি।

এমরিগান পার্ক

খাইরুল্লাহ দামারছী সাহেব আমাদেরকে প্রথমে ইস্তাম্বুলের একটি প্রাচীন ও সুদৃশ্য পার্কে নিয়ে যান। পার্কটির নাম এমরিগান পার্ক। পার্কটি সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের কন্যা তৈরী করেন বলে বর্ণিত আছে। উসমানী খেলাফতের যুগে এটি শহরের উৎকৃষ্টতম বিনোদন কেন্দ্র ছিল। পার্কটি বসফরাসের ইউরোপীয় উপকূলের একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে বসফরাসের দিকে তাকালে বাগানের কয়েকটি খণ্ডকে অল্প অল্প ব্যবধানে দীর্ঘ ও প্রশস্ত সিঁড়ির মত সমুদ্রে নামতে দেখা যায়। ইস্তাম্বুলের ভূমি ও তার পাহাড় এমনিতেও অত্যন্ত সবুজ শ্যামল। এই পার্কের সবুজ বৃক্ষরাজি ও ফুলসমূহ যেই সুশৃংখল ও সুবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে আছে তাতে এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন মার্চ মাস হলেও শীত অনেক। সবুজ ভূমি হেমন্তের আক্রমণ থেকে এখনও মুক্তি পায়নি। পথপ্রদর্শকগণ জানালেন, বসন্তকালে এই সবুজ ভূমি ফুলে ফলে ছেয়ে যায়। পার্কের মধ্যে বৃক্ষসারির মাঝে মাঝে সুদৃশ্য পুকুর রয়েছে এবং গাছের ছায়ায় উপবেশন করার সুন্দর সুন্দর আসন বানানো আছে। পার্কের সব জায়গা থেকে সম্মুখে প্রবাহমান বসফরাস এবং তার বিপরীত দিকের এশিয়ার উপকূলের পাহাড় সারি নয়ন মনকে আকৃষ্ট করে।

পার্কের মাঝ বরাবর কসরে আসফার (হরিদ্রা ভবন) নামে একটি জাঁকজমকপূর্ণ পুরাতন ভবন রয়েছে। এটি উসমানী যুগের জেনারেল

ইসমাইল খাদিয়ু পাশার ভবন। বর্তমানে এটি পার্কের রেঁস্তোরারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যাই হোক, পার্কটি উসমানীদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার দর্পণ এবং সুন্দর রুচিবোধের উৎকৃষ্টতম একটি স্মৃতি হয়ে আছে।

রুমেলী দূর্গ

এখান থেকে আমরা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কর্তৃক নির্মিত 'রুমেলী দূর্গ' দেখতে যাই। আমার এটি দেখার বাসনা দীর্ঘদিন যাবত ছিল। আমি কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ের বিস্তারিত আলোচনার শুরুতে লিখেছি যে, বায়েজীদ ইয়ালদারম্ বসফরাস প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার এশীয় উপকূলের সেই স্থানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন, যেখানে বসফরাসের প্রস্থ সর্বাধিক কম। বায়েজীদ ইয়ালদারম্ কর্তৃক নির্মিত এই দূর্গের নাম 'আনাদুল দূর্গ'। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ উপলব্ধি করেন যে, বসফরাসকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শুধু আনাদুল দূর্গ যথেষ্ট নয়। তাই তিনি আনাদুল দূর্গের ঠিক বরাবরে ইউরোপীয় উপকূলে আরেকটি দূর্গ নির্মাণ করেন। এই দূর্গের নামই রুমেলী দূর্গ।

এই দূর্গ নির্মাণও সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের একটি বিরাট বড় ঐতিহাসিক কীর্তি। এই ঐতিহাসিক ভবন তিন হাজার বর্গমিটার ভূমিতে বিস্তৃত। এতে সতেরটি শৃঙ্গ রয়েছে। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের একজন প্রকৌশলী মুসলেহ উদ্দীন আগা এর নকশা তৈরী করেন। 'মুহাম্মাদ' শব্দের আদলে এই দূর্গের নকশা তৈরী করা হয়। যে কোন ব্যক্তি প্লেন থেকে তা স্পষ্ট দেখতে পায়। সতেরটি শৃঙ্গের তিনটি অত্যন্ত উঁচু। এগুলোকে 'সারুকা' বলা হয়। এর উচ্চতা সাততলা (প্রায় ৯০ ফুট) পরিমাণ। এর প্রাচীর ৯ মিটার চওড়া। প্রাচীরের দেয়াল পাঁচ থেকে পনের ফুট উঁচু।

দূর্গের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হল, তবে এর সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মাত্র চার মাস চার দিনে সম্পূর্ণ দূর্গ তৈরী করা হয়। ২৪শে এপ্রিল ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ২৮শে আগষ্ট ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে তা শেষ হয়। বর্তমানে স্থাপত্য শিল্প এত

উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত এমন একটি দূর্গের নকশাও চার মাসে তৈরী করা সম্ভব হবে না।

বর্তমানে দূর্গের কিছু অংশ সম্ভবতঃ সামরিক চৌকিরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর বেশির ভাগই একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিরূপে পর্যটকদের মনোরঞ্জন কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। দূর্গের জমকালো ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে একটি লম্বা আঙ্গিনায় ঐতিহাসিক কয়েকটি বস্তু রক্ষিত দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের একটি তোপও রয়েছে, যা কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর সাথেই আরেকটি তোপ সুলতান আবদুল হামীদের নামে রয়েছে। আঙ্গিনার মাটিতে গোল্ডেন হর্নের (সোনালী শিং) মুখে বাধা রোমানদের সেই শিকলের চারটি বালা রয়েছে, যা রোমানরা উসমানীদের জাহাজ সোনালী শিং এর ভেতরে যেন প্রবেশ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তার মুখে লাগিয়েছিল। আর এ কারণেই সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের হাতে স্থলপথে জাহাজ চালানোর বিস্ময়কর সেই ঘটনা ঘটেছিল।

যাই হোক, বাল্যকালে এই দূর্গের আলোচনা বইয়ে পড়েছিলাম এবং এর বিভিন্ন আকৃতি কল্পনা করেছিলাম। আজ এ দূর্গ দেখার সেই বাসনা পূর্ণ হল।

বসফরাসের পুল এবং এশীয় ইস্তাম্বুল

আমাদের সামনের গন্তব্য ইস্তাম্বুলের এশীয় অংশ 'ইস্কোদার'। বসফরাস অতিক্রম করার জন্য ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন অংশ থেকে নৌকা চলাচল করে। তবে ইদানিং বসফরাস প্রণালীর উপর বিশাল এক পুল তৈরী করা হয়েছে। এই পুল ইউরোপ ও এশিয়াকে সড়কপথে যুক্ত করেছে। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে গাড়ী চলার জন্য পুলটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এটি একটি ঝুলন্ত পুল। যার শুধুমাত্র দুই তীরে দুইটি করে লোহার স্তম্ভ রয়েছে। দুইটি ইউরোপে আর দুইটি এশিয়ায়। মাঝখানে সমুদ্রের মধ্যে কোন স্তম্ভ নেই। স্তম্ভের পরিবর্তে চন্দ্রাকৃতির ঝুলন্ত দুটি লোহার মজবুত রশি উপর থেকে পুলকে ধারণ করে রেখেছে। পুলের দৈর্ঘ্য ১০৭৪ মিটার এবং প্রস্থ ৩৩.৪০ মিটার। সমুদ্র থেকে পুলের উচ্চতা ৬৪ মিটার। তার

উভয় দিকের স্তম্ভ ১৬৫ মিটার উঁচু। সমুদ্র তীরে দাঁড়ালে পুলের উপরের চলন্ত গাড়ীগুলোকে অনেক ছোট দেখা যায়। পুলকে এত উঁচু রাখা হয়েছে, যেন বসফরাসের বুকে চলাচলকারী জাহাজগুলোর জন্য এটি সমস্যা না হয়ে যায় এবং জাহাজ অনায়াসে এর নীচ দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। যার ফলে পুলটি অতি সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ এবং সর্বদা ব্যস্ত থাকে। এর উপর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে দুই লক্ষ গাড়ী বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে। এমন কোন সময় নেই যখন গাড়ীর এক দীর্ঘ সারি এর উপর ছুটতে দেখা না যায়।

আমরা ঐ পুলের উপর দিয়ে বসফরাস অতিক্রম করি। ইস্তাম্বুলের এশীয় অংশকে ইস্কোদার বলা হয় এবং এশিয়ায় অবস্থিত তুরস্কের সম্পূর্ণ ভূখণ্ডকে আনাতুলিয়া বলা হয়। পুল পার হয়ে আমরা ইস্কোদারে প্রবেশ করি। শহরের এশীয় এই অংশও অত্যন্ত সুন্দর, বিস্তৃত ও প্রশস্ত। আমরা এর বিভিন্ন সড়ক অতিক্রম করে মরমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উলূমে ইসলামীয়ার প্রফেসর ডঃ ইউসুফ কালীজ আমাদের জন্য এখানে প্রতীক্ষা করছিলেন। আমাদের তুর্কী বন্ধু ডঃ সালেহ তাউগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলাহিয়াত বিভাগের ডিন। তিনি এতদিন ইস্তাম্বুলের বাইরে ছিলেন। তাই তার সাথে সাক্ষাত হয়নি। ডঃ কালীজের সঙ্গে তার কক্ষে গিয়ে দেখি তিনি বাইরে চলে গেছেন। ফলে এখানেও তার সাথে সাক্ষাত হল না। ডঃ কালীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখালেন। এটি তুরস্কের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে এর ধর্ম বিভাগ এবং 'উলূমে ইসলামীয়া' বিভাগ তুরস্কে অতি নাম করা। কিন্তু অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানেও উলূম ইসলামীয়ার বিষয়টি একটি মতবাদ এবং দর্শনের পর্যায়ে পঠন পাঠন হয়ে থাকে। শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবেশে এসব জ্ঞানের উপর আমলের পরছায়াও দেখা যায় না। আল্লাহর সমীপেই সকল অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোহর নামায পড়ার পর খাইরুল্লাহ দামারছী সাহেব আমাদেরকে বসফরাসের এশীয় উপকূলে উসমানী যুগের বানানো আরো একটি সুন্দর উদ্যানে নিয়ে যান। তিনি সেখানে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। সবুজ, শ্যামল ও প্রশান্ত এই পরিবেশে তুর্কী বন্ধুদের সঙ্গে

মধ্যাহ্ন ভোজটি বড় উপভোগ্য ছিল।

এখান থেকে আমরা হোটেলে ফিরে যাই। আসর নামাযের পরই এয়ারপোর্ট অভিমুখে যাত্রা করি। কনফারেন্সের প্রটোকল অফিসার ছাড়া ডঃ ইউসুফ কালীজও এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমাদের সাথে আসেন। মাগরিব নামায পড়েই তুর্কীশ এয়ারওয়েজের বিমানে আরোহন করি। তুরস্কে অবস্থানের সুখময় স্মৃতি সারাপথ আমার সহচর হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে এখানে অতিবাহিত এই দিনগুলো অত্যন্ত স্মরণীয়, মধুর এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ ছিল। যার কথা দীর্ঘদিন ভুলতে পারিনি।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ইস্তাম্বুলের এ সকল বন্ধুর সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাত। এ কয়দিনেই তাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারা আমাকে আরো কয়েকদিন অবস্থান করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। তারা তুরস্কের অন্যান্য প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে যাওয়ার কথা বলছিলেন। বিশেষ করে কাউনিয়া, আনকোরা, বুরেছা ও ইযমীর যাওয়ার কথা জোর দিয়ে বলছিলেন। আমার চিন্তাতেও এ কথা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছিল যে, আল্লাহ জানেন, এখানে আর কোন দিন আসা হয় কি না হয়—তাই আর কয়েকদিন অবস্থান করলে ক্ষতি কি? পি.আই.এ-এর প্লেনও ছিল তিন দিন পর। আর পি.আই.এ-তে দেশে ফেরা আমার জন্য অধিকতর সহজ ছিল। তাছাড়া তুরস্কে আমার বেশ ভালও লাগছিল, মনও বসছিল। কিন্তু আমার অন্তরে এক অজানা আতঙ্ক ছেয়ে যায়। যুক্তি-বুদ্ধি ও হৃদয়ের এ সকল চাহিদার উপর সেই আতংক এমন প্রবল হয়ে যায় যে, অবশেষে আজই তুর্কীশ এয়ারওয়েজে করাচী যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং সিটও বুক করাই। আমার নিকট অজানা এই আতংক ছাড়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন কোন যুক্তিযুক্ত কারণও ছিল না, যা আমি বন্ধুদের পীড়াপীড়ির উত্তরে তুলে ধরতে পারি। আমি তাদেরকে বিশেষ কিছু কারণে অতিসত্বর করাচী যেতে হবে এ কথা বলে নিরস্ত করি।

আমি নিজেও অবাক হচ্ছিলাম যে, তুরস্কে মনোরঞ্জনের এতসব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি কেন? বাহ্যিকভাবে আমার সম্মুখে তাৎক্ষণিক কোন আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু করাচী

এয়ারপোর্টে নেমে লাউঞ্জের মধ্যেই আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর জনাব শারাফত হুসাইন সাহেব এবং আমার বিশেষ সহযোগী মওলভী আবদুল্লাহ মায়মান বললেন যে, অধমের শায়েখ (আরেফ বিল্লাহ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব আরেফী (কুদ্দিসা সিররুহু) কয়েক দিন যাবৎ শয্যাশায়ী। আজ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা চলছে। সাথে সাথে আমার মাথা ঘুরে গেল। জিনিসপত্র বাড়ীতে রেখে আমি সোজা হযরতের বাড়ীতে চলে যাই। ততক্ষণে হযরত হাসপাতালে চলে গেছেন। আমি সেখানে গেলাম। রোগশয্যায় তিনি বড় কষ্টে ছিলেন, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু অধমকে দেখে অভ্যাস মত আনন্দ প্রকাশ করে বললেন ঃ 'ভাই! তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। তবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'

এই জাতীয় কয়েকটি কথা বললেন। পরের দিন ফজরের আযানের সময় হেদায়েতের এই সূর্য পার্থিব জগত ত্যাগ করেন।

انا لله وانااليه راجعون

এ সকল ঘটনা এত দ্রুত ঘটতে থাকে যে, দুশ্চিন্তা আর মনবেদনার তোড়ে কিছু ভাবার ও বোঝার সুযোগই পাইনি। পরে চিন্তা করে বুঝতে পারি যে, ইস্তাম্বুল থেকে অনতিবিলম্বে যাত্রা করার সেই প্রচণ্ড তাড়া এবং মনের সেই অজানা আতংক কি কারণে সৃষ্টি হয়েছিল? আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া আর অনুগ্রহ যে, আমি অজানা সেই চাহিদা অনুপাতে কাজ করে তৎক্ষণাত ফিরে আসি। আর একদিনও যদি দেরী হত, তাহলে হযরতকে দেখার ভাগ্য আমার হত না। আর সেজন্য আজীবন যে মনোবেদনা হত, তার প্রতিকারের কোন পথও ছিল না।

দ্বীপের দেশে

[সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া সফর]

সফরকাল ঃ শাবান ১৪০২ হিজরী
মোতাবেক জুন ১৯৮২ ঈসায়ী

দ্বীপের দেশে

কিছুদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়া সরকার পাকিস্তান সরকারকে তার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী এবং পাকিস্তানের আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা-প্রতিষ্ঠান এবং সেখানকার ধর্মীয় পরিবেশ পরিস্থিতি পরিদর্শন করার জন্য নিমন্ত্রণ জানান। উভয় দেশের সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য বৃদ্ধিই ছিল এর উদ্দেশ্য। প্রতিনিধি দলের ভ্রমণ তারিখ কয়েক মাস পর্যন্ত পরিবর্তন হতে থাকে। পরিশেষে জুনের প্রথম সপ্তাহ এর জন্য নির্ধারিত হয়।

প্রতিনিধি দলে পাকিস্তানের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী আলহাজ মুহাম্মাদ আব্বাস খান আব্বাসী সাহেব ছাড়াও জাষ্টিজ মাওলানা পীর মুহাম্মাদ করম শাহ্ সাহেব, জজ, সমন্বিত শরয়ী আদালত। মিঞা ফজলে হক সাহেব, মুহতামিম, জামিয়া সলফিয়া ফয়সালাবাদ। মাওলানা শাবিহুল হাসানাইন মুহাম্মাদী, মুহতামিম, মাদ্রাসা আল-ওয়ায়েজীন, লাহোর। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ আমিনুল্লাহ দাছীর সাহেব এবং আমি লেখক অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

১লা জুন ১৯৮২ ঈসায়ী সকাল পৌনে দশটায় করাচী থেকে পি.আই.এ এর বিমানে সিঙ্গাপুর যাত্রা করি। করাচী থেকে কুয়ালালামপুর পর্যন্ত প্রায় ছয় ঘন্টার দীর্ঘ এই সফরে বিমানটি হিন্দুস্তানকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে মাদ্রাজের দিক হয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। প্রায় তিন ঘন্টা সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়তে থাকে। অবশেষে পাকিস্তানী সময় অনুযায়ী বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটায় মালয়েশিয়া সীমান্তে প্রবেশ করে। উড়ন্ত বিমান থেকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি মালয়েশিয়ার উপদ্বীপ অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। সবুজ মখমলের সুন্দর বিছানার মাঝে এঁকে বেঁকে সমুদ্রে পতিত নদীসমূহ অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। দেখতে দেখতে কুয়ালালামপুর শহর সামনে চলে আসে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা বিমান বন্দরে অবতরণ করি।

পাকিস্তানের সময় থেকে এখানকার সময় এগিয়ে। এজন্য এখন

এখানে প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। সূর্য ডুবতে অল্প সময় বাকী। শহরের ভিতরে যাওয়ার প্রোগ্রাম নেই। বিমান বন্দরেই এক ঘন্টা সময় কাটাতে হয়। এটি আমেরিকান ধাঁচের একটি অত্যাধুনিক বিমান বন্দর। ঝকঝকে, পরিস্কার ও সুন্দর। আধুনিক ধাঁচের সজ্জিত দোকানপাট, রেঁস্তোরা ইত্যাদি। নতুন একটি মুসলিম দেশ এই প্রথমবার দেখলাম। হৃদয়ে ভালবাসার আবেগ তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। মালয়েশিয়ার মুসলমানদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে এবং আমারও অভিজ্ঞতা হলো যে, তারা অকপট হৃদয় এবং স্বচ্ছ অন্তরের মানুষ। কিন্তু বিমান বন্দরে এমন কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলো না, যা একে একটি মুসলমান দেশ বলে প্রমাণ করে। হায় ! আমাদের দেশগুলোর যদি নিজেদের স্বকীয়তা সমুজ্জ্বল করার এবং সে জন্যে গর্ববোধ করার আগ্রহ থাকত। বিমান বন্দর একটি দেশ বা শহরের ফটক। যে ফটকে প্রবেশ করতেই একজন মানুষ অনুভব করতে পারে যে, সে একটি মুসলিম দেশে প্রবেশ করেছে, না অমুসলিম দেশে। মাগরিব নামাযের সময় হয়েছে। অল্প সময়ে তালাশ করে নামায পড়ার মত উপযুক্ত কোন স্থান দেখতে পেলাম না। বিমান ছাড়ার সময়ও ঘনিয়ে আসছিল, তাই ফিরে এসে বিমানেই নামায আদায় করি।

বিমানের পরবর্তী গন্তব্য সিঙ্গাপুর। বিমানটি কুয়ালালামপুর থেকে সেখানকার দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মিনিটে অতিক্রম করে। সিঙ্গাপুর মূলত মালয়েশিয়ারই একটি অংশ ছিল। কিন্তু পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা এই ভূখণ্ডকে স্বাধীনতা দানকালে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়। প্রথম এবং বৃহৎ অংশ 'মালই' বা 'মালয়েশিয়া' নামে পরিচিত। এতে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। আর ছোট একটি দ্বীপ সিঙ্গাপুর নাম নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র হয়েছে। সেখানে অমুসলিমরা শাসন করছে। সেখানকার অধিবাসীদের বেশির ভাগই চীনা বংশদ্ভূত।

সিঙ্গাপুরের নিজস্ব কোন কৃষি বা শিল্প কিছুই নেই, তবে ফ্রি পোর্ট (উন্মুক্ত বন্দর) হওয়ায় এটি বিরাট বড় ব্যবসা কেন্দ্রের রূপ লাভ করে। আর সম্ভবত এ জন্যই নগরায়নিক সৌন্দর্য ও সুব্যবস্থাপনার দিক থেকে একে ইউরোপের একটি উন্নত শহর বলে মনে হয়। সম্পূর্ণ শহর আকাশচুম্বী সুদৃশ্য ভবনে পরিপূর্ণ। আয়নার মত ঝকঝকে পরিস্কার

সড়ক। ট্রাফিক ব্যবস্থা সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত। বসতি ঘন নয়, বরং বিস্তৃত ও প্রশস্ত। ভারত মহাসাগরের পানি নদীর আকৃতিতে জায়গায় জায়গায় শহরের ভেতরে প্রবেশ করেছে। এগুলোর উপর নির্মিত কয়েক তলা বিশিষ্ট সেতু, কেবলমাত্র পথ চলাকেই শুধু সহজ করে দেয়নি, বরং এর সৌন্দর্য্যও অনেক গুণে বৃদ্ধি করেছে।

আমাদের রাত কাটে সিঙ্গাপুরে। পরদিন বেলা পৌনে বারটায় আমরা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের বিমানে জাকার্তা অভিমুখে যাত্রা করি। দেড় ঘন্টার এই সফরের বেশি অংশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ইন্দোনেশিয়ার ছোট ছোট উপদ্বীপ সামনে আসতে থাকে। তারপর জাভার বিস্তৃত দ্বীপ আরম্ভ হয় এবং দেখতে দেখতে জাকার্তার জনবসতি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

জাকার্তার বিমান বন্দরে ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী, অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, দূতাবাসের অন্যান্য কর্মচারী ও ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী বিরাট একটি জামাত অত্যন্ত ভালবাসা ও আবেগ নিয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানায়। জাকার্তা শহরে প্রবেশ করার সময় মনে হচ্ছিল যেন ঢাকায় প্রবেশ করছি। এখানকার মাটি ও বাড়ীঘরের ধরন, সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির বাংলাদেশের সাথে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। পার্থক্য এই যে, তেল ও অন্যান্য খনিজ সামগ্রী জাকার্তাকে নগরায়নিক উন্নয়নে অনেক অগ্রসর করেছে। উপমহাদেশের অন্য কোন দেশ এ জিনিস পায়নি।

ইন্দোনেশিয়া ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ–পূর্ব এবং অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিমে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপ সমন্বিত একটি দেশ। দেশটি প্রায় তের হাজার ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশ বাদে এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। এর প্রাচীন নাম 'নওমা নশালরা' (মধ্যবর্তী দ্বীপ)। প্রথম ও দ্বিতীয় খৃষ্ট শতাব্দীতে এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বণিকদের বসবাস ছিল। তারা বিভিন্ন দ্বীপে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রায় চতুর্থ শতাব্দী থেকে সর্বপ্রথম 'সামাট্রা' দ্বীপে, অতঃপর 'জাভা'তে ইসলাম প্রবেশ করে। কিছু আল্লাহওয়ালা ভারতের

মত সুদূরবর্তী এই দ্বীপসমূহেও ইসলামের তাবলীগ করেন। তাঁরা তাঁদের নীরব ও শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ অঞ্চলকে শুধুমাত্র ইসলামের অধীনেই আনেননি বরং শেষ পর্যন্ত এখানে মুসলমানদের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল বুযুর্গের মধ্যে শায়েখ আবদুল্লাহ আরেফ (রহঃ), হযরত মাওলানা ইবরাহীম (রহঃ), হযরত রাবীন (রহঃ), মাখদুম ইবরাহীম (রহঃ), শায়েখ ফতহুল্লাহ (রহঃ) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীতে ওলন্দাজ বণিকেরা এ অঞ্চলে আসে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের ঐতিহ্যগত ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে এ অঞ্চলকে তাদের সাম্রাজ্যের টার্গেট বানায়। তখন এ সমস্ত দ্বীপ একটি একটি করে তাদের অধীনে চলে যায়। ওলন্দাজদের শাসনামলে এ সমস্ত দ্বীপকে 'জাযায়েরে শিরকুল হিন্দ' বা 'ওলন্দাজী শিরকুল হিন্দ' বলা হত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে একজন জার্মানী বিশেষজ্ঞ একে ইন্দোনেশিয়া নাম দেয়।

এর শব্দ মূল গ্রীক ভাষার একটি সংযুক্ত শব্দ, যার অর্থ সমুদ্র ও দ্বীপ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতাকামীরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে 'ওলন্দাজী শিরকুল হিন্দ' নাম পরিবর্তন করে ইন্দোনেশিয়া নাম ধারণ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ নামই সরকারীভাবে স্বীকৃতি পায়।

ইন্দোনেশিয়ার অসংখ্য দ্বীপের মধ্য থেকে জাভা, সুমাত্রা, মাদুরা, বংকা, বর্নিও, সালাদেসী, মালুকু, সাবেন্দা ইত্যাদি অধিক প্রসিদ্ধ। রাজধানী জাকার্তা জাভা দ্বীপের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এসব দ্বীপ বিষুবরেখার কাছে হওয়ায় এখানে প্রচণ্ড গরম পড়ে এবং বৃষ্টিও হয় প্রচুর। এ অঞ্চল শীত ঋতু কি, তা চেনে না। এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছাড়া তৃতীয় কোন ঋতু নেই। এতদসত্ত্বেও অবাক হলাম যে, এখানে ফ্যানের ব্যবহার খুব কম। আমরা যেখানে গরমে ঘর্মাক্ত হয়ে যাই, সেখানে এ দেশের লোকেরা ফ্যান ছাড়াই শান্তভাবে বসে থাকে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, তারা স্বদেশের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের ঘাম ঝরে না।

ইন্দোনেশিয়া অত্যন্ত সবুজ শ্যামল ও সুন্দর একটি দেশ। তেল ছাড়াও রাবার, টিন, চা, কফি, সাগওয়ান এবং বিভিন্ন ধরনের ফল

(যার অনেকগুলো ছিল আমাদের জন্য একেবারে নতুন) এখানকার বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত বিনম্র চরিত্র, সৎ স্বভাব সম্পন্ন, সহনশীল ও গম্ভীর। আমরা এখানের এক সপ্তাহ অবস্থান কালে কখনো দুই ব্যক্তিকে ঝগড় বিবাদ করতে বা উত্তেজিত হতে দেখিনি।

ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ৯০% লোকই মুসলমান। অবশিষ্ট ১০% এর মধ্যে খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি রয়েছে। যখন ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এখানে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়, তখন সকল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করে। সে সময় মুসলিম ও অমুসলিম জনগণকে এক প্লাটফর্মে আনার জন্য পাঁচটি মূলনীতি গ্রহণ করা হয়। যা 'পঞ্চনীতি' নামে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চনীতির মূলকথা পারস্পরিক ধর্মীয় সৌহার্দ্য। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর অমুসলিমরা এই পঞ্চনীতিকে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আর এতে করে সেখানে ইসলামী হুকুমাতের দাবীদারদের এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার পতাকাবাহী দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। 'মাসজুমী পার্টি', 'নাহজাতুল উলামা' ও 'আল-জামাআতুল মুহাম্মাদীয়া' এখানকার প্রসিদ্ধ ইসলামী দল। তারা এখানে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করছে।

'মাসজুমী পার্টি'র লিডার ডঃ নাসীর কিছুদিন প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট 'সুইকার নু' এর শাসনকালে যখন কম্যুনিষ্ট পার্টি সরকারকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা করে, তখন জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে কঠোর হস্তে নির্মূল করা হয়। তারপর জেনারেল সুহার্তো রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে নেন এবং বর্তমানে তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান।

বর্তমান সরকার কম্যুনিষ্টদের মোকাবেলা করার জন্য ইসলামী দলসমূহেরও সহযোগিতা গ্রহণ করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দমন করার পর সে দেশে নিরেট ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকে ইসলামী দলসমূহ এবং বর্তমান সরকারের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেয়। বর্তমানে সংসদে নয়শ'রও অধিক আসন রয়েছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র তিনশ'র কিছু বেশি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসে।

অবশিষ্ট প্রায় ছয়শ জনকে মনোনীত করা হয়। ফলে কোন দল নির্বাচনে একশ' ভাগ সফল হলেও তারা সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে মাসজুমী পার্টি, নাহজাতুল উলামা, আল–জামাআতুল মুহাম্মাদীয়া এবং অন্যান্য ইসলামী দলসমূহ সম্মিলিত প্লাটফর্ম তৈরী করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে তারা সম্মিলিতভাবে মোট তিরাশিটি আসন পায়। তাদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করা হয় যে, নির্বাচনে চাপ সৃষ্টি ও কারচুপি করেও অনেক কাজ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির কারণে রাজনৈতিক পর্যায়ের ধর্মীয় আন্দোলন মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাহ্যত তাদের জন্য রাজনীতির পথ অবরুদ্ধ দেখা যায়। এখন ইসলামী দলগুলো বেশির ভাগ তালীম ও তাবলীগের কাজে লিপ্ত।

আমাদের দেশের মত ইন্দোনেশিয়াতেও প্রাচীন ধারার বিরাট সংখ্যক দ্বীনি মাদ্রাসা রয়েছে। কিন্তু তার বেশির ভাগ মাদ্রাসাই গ্রামাঞ্চলে। আমরা চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেগুলো দেখার সুযোগ পায়নি। ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আমাদের এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল। সপ্তাহ কালের সংক্ষিপ্ত এই সময়ে তারা বেশির ভাগ সরকারের পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহই দেখাতে সক্ষম হয়। সর্বপ্রথম আমাদেরকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ দেখানো হয়। তাদের এই মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনার মান নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে তারা হজ্জের যে ব্যবস্থাপনা করেছে, তা অন্যান্য মুসলিম দেশের জন্য অনুসরণযোগ্য। এখানে হাজীদের নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই। প্রতি বছর সরকারের পক্ষ থেকে হজ্জের ব্যয়ের নির্ধারিত পরিমাণ ঘোষণা করা হয়। সেই পরিমাণ ব্যয় বহনে সক্ষম যে কোন ব্যক্তি হজ্জের জন্য দরখাস্ত করতে পারে এবং তার আবেদন অবশ্যই গৃহীত হয়।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে হাজীদের গ্রুপ তৈরী করা হয়। সকল হাজীর সামানা পর্যন্ত এক ধরনের হয়ে থাকে। জাকার্তায় 'হাজী হোষ্টেল' নামে হাজী ক্যাম্পের মত বিশাল ভবন রয়েছে। সেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হজ্জে গমনেচ্ছু লোকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ভবনটির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত মানসম্পন্ন।

এখানে হাজীদের বিভিন্ন গ্রুপকে তিন দিন পর্যন্ত হজ্জের বিভিন্ন করণীয় বিষয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সরকারের ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত দুটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও দেখার সুযোগ হয়। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বেশ উন্নত মনে হল। তবে এটা দেখে বিস্ময়ও জাগল এবং দুঃখও হলো যে, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রফেসরও এজন্য অসন্তুষ্ট, কিন্তু এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা বর্তমানে তাদের হাতে নেই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এখানকার ছাত্রীদের পোশাক অনেকটা পর্দাসম্মত। আর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের সাধারণ পোশাকই হল স্কার্ট। অধম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে একথা জিজ্ঞাসা করি যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়তে সহশিক্ষা ব্যবস্থার কোনরূপ বৈধতা আছে কি? তখন তিনি বিষন্ন এক হাসি হেসে দুঃখের সাথে বললেন ঃ 'এটি ইন্দোনেশীয় ইসলাম'।

সুয়ারাবায়া পূর্ব জাভার প্রধান কেন্দ্র। সুয়ারাবায়া জাভা দ্বীপের পূর্ব তীরে অবস্থিত। এটি ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। আমাদেরকে সেখানেও নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে নাহজাতুল উলামার তত্ত্বাবধানে 'খাদীজা ইন্সটিটিউট' নামে মেয়েদের জন্য একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র ছাত্রীরা লেখাপড়া করে। তাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিশেষ মানসম্পন্ন একটি পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয়েছে। বিরাট সংখ্যক ছাত্রী এখানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তবে নাহজাতুল উলামার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই শিক্ষা কেন্দ্রেও দ্বীনি ইলমের উজ্জ্বলতা কম অনুভব হওয়ায় দুঃখ হল।

ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে সেখানে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্ম মেনে চলার স্বাধীনতা তো অবশ্যই আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জনসাধারণের জীবন ইসলামী বিধান মোতাবেক ঢেলে সাজানোর কোন আন্দোলন নেই। শুধু তাই নয়, বরং

এই জাতীয় আন্দোলনকে দেশের মূলনীতি 'পাঞ্জা শীলার' পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। এইজন্য ধর্মীয় দিক থেকে দেশের অবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সেখানে খৃষ্টান মিশনারীর অপতৎপরতা খুব পরিকল্পিতভাবে অব্যাহত রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ খৃষ্টানদের কর্তৃত্বাধীন। ব্যবসা বাণিজ্যে চীনা অধিবাসীদের আধিপত্য বিদ্যমান। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলসমূহ সেখানে পরাজিত ও হস্তপদহীন।

হতাশাজনক এ সকল অবস্থাতেও আশার যেই দ্বীপ্তিমান জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল ঃ এখানকার জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণদের ধর্মীয় উদ্দীপনা। এমন প্রতিকূল অবস্থাতেও প্রত্যেকটি মসজিদে বিরাট সংখ্যক স্বল্পবয়স্ক তরুণদের উপস্থিতি দেখা যায়। একে কুদরাতের এক অদৃশ্য কারিশমাই বলা যায় যে, দেশের প্রতিটি মসজিদে 'শুব্বানুল মাসজিদ' (মসজিদের তরুণদল) নামে তরুণদের একটি ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে। যা তরুণদের মাঝে দ্বীনের পয়গাম প্রচারের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ কর্ম সম্পাদন করছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল ঃ এই সংগঠনের কোন কেন্দ্র বা প্রধান কার্যালয় নেই এবং সমগ্র দেশব্যাপী এর কোন কেন্দ্রীয় সংগঠনও নেই। অনেক সময় এক মসজিদের তরুণদের অন্য মসজিদের তরুণদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগও থাকে না। শুধুমাত্র প্রত্যেক মসজিদের আশেপাশে বসবাসকারী তরুণেরা মহল্লাভিত্তিক নিজেরাই এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে থাকে। নামাযান্তে তাদের সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়। সেখানে তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞানদান করা হয়। সাধারণত মসজিদের ইমাম সাহেব তাদেরকে দিক নির্দেশনা দান করেন। এভাবে এই সংগঠন দিনে দিনে বিস্তৃতি লাভ করছে। মাসজুমী পার্টির সাবেক দলনেতা ডঃ নাসীর আমাদের আগমনের সংবাদ শুনে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হোটেলে আসেন। তিনি বললেন ঃ শুব্বানুল মসজিদের অদৃশ্য শক্তি বর্তমানে আমাদের আশা আকাংখার বড় একটি কেন্দ্র। এই সংগঠনের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোন দলের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক নেই। আমাদের জন্য এর ব্যাখ্যা দান দুষ্কর যে, কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রত্যেক মসজিদে কি করে এসব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল? তবে এই বাস্তবতাও অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, প্রত্যেকটি মসজিদে এ সংগঠন রয়েছে এবং

তার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়া অবস্থানকালে সেখানে কাদিয়ানী দলের বিশেষ অপতৎপরতা গভীরভাবে উপলব্ধি করি। পক্ষান্তরে মুসলমানদের তাবলীগি তৎপরতা না থাকার মতই। ফলে জনসাধারণ তো দূরের কথা, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরও কাদিয়ানীদের সম্পর্কে জ্ঞান নেই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কাদিয়ানী লেখকদের বই দেখলাম। লাইব্রেরীয়ান বলল ঃ এগুলো লাইব্রেরীতে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। অথচ কাদিয়ানীদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদের ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তুলে ধরার জন্য কোন গ্রন্থই সেখানে নেই। এ পর্যায়ে মুসলমান ধর্মপ্রচারক দলের জন্য এটি একটি চিন্তার বিষয়। তাই ইংরেজী ভাষায় কাদিয়ানীদের সরূপ উদঘাটনকারী বই-পুস্তক ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

জাকার্তা ছাড়াও সুরাবায়া এবং তার নিকটবর্তী পাহাড়ী অঞ্চল বাতুতে যাই। কিন্তু সংক্ষিপ্ত এই সফরে জাভা ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার অন্য কোন দ্বীপে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। পাঁচদিন অবস্থান করার পর আমরা ৭ই জুন ১৯৮২ ঈসায়ী বিকেল বেলা জাকার্তা থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমরা প্রায় ২৪ ঘন্টা সিঙ্গাপুরে অবস্থান করি। সিঙ্গাপুর মূলত মালয়েশিয়ার অধীনেই ছিল। পরে একটি চুক্তির অধীনে তা মালয়েশিয়া থেকে পৃথক হয়ে যায়। বর্তমানে এটি বিষুবরেখার একেবারে নীচের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশটি অল্প সময়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। বাণিজ্যের দিক দিয়ে এটি এশিয়ার ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দর। নগরায়নিক সৌন্দর্যের দিক থেকে একে ইউরোপ আমেরিকার শহর বলে মনে হয়। এখানে মুসলমানের সংখ্যা অল্প। ৮০ শতাংশ অধিবাসী চীনা বংশোদ্ভূত। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য মসজিদ এবং ইবাদত বন্দেগীর উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের মাঝখানের সুলতান মসজিদ সৌন্দর্য, কারুকার্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত মানসম্পন্ন একটি মসজিদ। মসজিদটি দেখে মন আনন্দে ভরে গেল। জানতে পারলাম এদেশে মসজিদের জন্য চাঁদা উঠানো হয় না। বরং সরকারী চাকুরীজীবী মুসলমানদের বেতন থেকে

মামুলী একটি অংশ রেখে দিয়ে তা দ্বারা সরকারীভাবে একটি ফাণ্ড তৈরী করা হয়েছে। এই ফাণ্ড থেকে মসজিদসমূহের প্রয়োজনাদি পুরণ করা হয়।

আটদিনের এই ভ্রমণে যেই বস্তুটির প্রভাব অধমের মনমগজকে আচ্ছন্ন করেছিল তা এই যে, বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশই পাশ্চাত্যের নগ্ন সয়লাবে মারাত্মকভাবে ভেসে গেছে। সেখান থেকে তাদের প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবীসুলভ দাওয়াত ও সংকল্পের অধিকারী মনোবৃত্তি দরকার। তবে আল্লাহর দয়ায় এই উপমহাদেশে দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ খাদেমদের চেষ্টা সাধনার ফলে এখানকার অবস্থা এখনও সীমা অতিক্রম করে যায়নি। যদি আমরা এখলাছ, লিল্লাহিয়্যাত, মেহনত ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করি, তাহলে এখনও এখানকার তুফানকে সহজে প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু এজন্য দ্বীনের এমন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ খাদেমের প্রয়োজন, যারা নিজেদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ওয়াকফ করে দেবে। যাদের উদ্দেশ্য ধনসম্পদ, পদ–প্রভাব, সুনাম, সুখ্যাতি বা ক্ষমতা অর্জন হবে না। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে জনসাধারণকে মজবুতভাবে ধর্মের উপর আমলে আগ্রহী করে তোলা। কিন্তু দুশ্চিন্তার ব্যাপার হল, এই প্রয়োজনের দিক থেকে আমাদের মনোযোগ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে আমাদের আকাবের ও পূর্বসূরীগণ পাশ্চাত্যের সয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য যেই প্রতিবন্ধক দাঁড় করেছিলেন এবং আজ পর্যন্ত বাস্তবেও তা ঐ তুফানকে প্রতিহত করে আসছিল, সেই বন্ধন ধীরে ধীরে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ না করুন, যদি আমরা এই দিকে যথোচিত মনোযোগ দান করে আমাদের চেষ্টার সঠিক দিক নির্ধারণ না করি, তাহলে এখানেও সেই দৃশ্য সামনে আসার আশংকা রয়েছে, যা অনেক মুসলিম দেশে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই অশুভ দিন না দেখান এবং সততা, নিষ্ঠা, লিল্লাহিয়্যাত ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক খিদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বাংলাদেশে কয়েক দিন

সফর কাল ঃ আগষ্ট, ১৯৮০ ইং

বাংলাদেশে কয়েক দিন

গত মাসে সিলেটের কাসিমুল উলূম মাদ্রাসার দাওয়াতে এক সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশে যাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখানে অধমের এটিই প্রথম সফর। ১৪ বছর পর। এই ভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট, ভিসার ধাপগুলো অতিক্রম করতে এবং ঢাকার বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশন ও কাষ্টমস ইত্যাদির কাজ সম্পাদনকালে আমার মনে যে অবস্থা বিরাজ করে, তা প্রকাশ করার জন্য আমার কাছে ভাষা নেই। তবে সাথে সাথে এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করি যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ বন্ধ থাকার পর এদিকের লোকেরা ওদিকের চেহারা দেখার সুযোগটুকু তো পেয়েছে।

ঢাকা পৌঁছার পর তার চেহারা অন্যরকম দেখতে পেলাম। গত দশ বছরে এই ভূখণ্ডে কত প্রলয়ই না ঘটে গেছে। বিপদ ও ঝঞ্ঝাটের কত পর্বতই না এখানে আপতিত হয়েছে। কত বিপ্লব দেখা দিয়েছে। এমন অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি বিদায় হয়েছেন, যাঁদের দর্শন–কল্পনা বাংলার সফরকে আকর্ষণীয় করে তুলত। যাদেরকে শিশু কিশোর দেখেছিলাম, তারা যৌবনে পদার্পন করেছে। যাদেরকে দুরন্ত তরুণ দেখেছিলাম, তারা দুর্বলতা ও বার্ধক্যের সীমান্তে উপনীত হয়েছে। পূর্বে মাদ্রাসাগুলোর প্রত্যেকে একথা বলত যে, আমি আপনার ওয়ালিদ সাহেবের ছাত্র। আর এবার বেশির ভাগকেই বলতে শুনলাম, আমি অমুক সনে আপনার সহপাঠী ছিলাম বা আমি অমুক সনে আপনার নিকট পড়েছি।

১৯৭১ এ বাংলার স্বাধীনতাকালে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন লোকের মুখে যে অসংখ্য প্রলয়ংকর দাস্তান আমরা শুনেছি, তা সে সময়ের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে আমাদের কল্পনা থেকে বাস্তবে অনেক বেশি। সত্য কথা এই যে, বাংলার মাটিতে নানা পথে ও নানা কারণে জুলুম–অত্যাচার ও নিপীড়নের দানব উলঙ্গ নৃত্য করেছে এবং তা এত দীর্ঘ সময় চালু থাকে যে, তার উপাখ্যান অত্যন্ত জটিল ও গ্রন্থীবদ্ধ। এর দায়–দায়িত্ব এত অধিক উপাদানের উপর বর্তায় যে, হয়তবা এ সময়ের

দুঃখময় সঠিক ইতিহাস কখনও লিখিত হবে না। কারণ, উপমহাদেশের কোন দেশেরই নিরপেক্ষতার সাথে এসব ঘটনার নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার সৎসাহস দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ব্যতীত, বাংলার কোণায় কোণায় জুলুম নির্যাতনের এত অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যে, কারো পক্ষে তা আয়ত্ত্ব করাও সম্ভব নয়। যাই হোক, সেখানকার স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলী ও অবস্থাদি শোনার পর এই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয় যে, সেখানে যেই কেয়ামত আবর্তিত হয়েছিল, তা আমাদের পাপেরই শাস্তি। ৯০ হাজার সশস্ত্র সেনাবাহিনীর এই পরাজয়—যার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না—কুদরতের পক্ষ থেকে শিক্ষার বেত্রাঘাত বৈ আর কিছু নয়।

১৯৭১ এর বিপ্লবের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই ভূখণ্ড জীবন মরণের টানা হেঁচড়ায় আক্রান্ত থাকার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন সামলে উঠেছে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা এখন ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অবস্থা অনেকটাই শুধরে গেছে। যুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীতে সর্বগ্রাসী যেই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া শেষ হয়েছে। দেশে সেই মারাত্মক অভাব এখন আর অবশিষ্ট নেই, যা অবস্থানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত লোকদের মেরুদণ্ডও ভেঙ্গে দিয়েছিল। তবে এসব সত্ত্বেও আমার মত একজন নব আগন্তুকের জন্য বিস্মিত হওয়ার ও শিক্ষা গ্রহণের অসংখ্য উপাদান এখনও বিদ্যমান রয়েছে। দ্রব্যমূল্য এখনও পাকিস্তানের তুলনায় মারাত্মক পর্যায়ের বেশি। অধমের যে সব দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য স্থানীয় মুদ্রার চেয়ে বেশি দেখলাম। খোলা বাজারে বাংলাদেশী টাকার মূল্য পাকিস্তানী রুপির তুলনায় প্রায় অর্ধেক, তাই এখানকার অভাব আপনা আপনিই অনুমান করা যায়। স্বাধীনতার পর কয়েক বছর পর্যন্ত আইন শৃংখলা, শান্তি ও নিরাপত্তা একেবারেই ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আর সে অবস্থা নেই। তবে এখনও মানুষ দশ বছর পূর্বের আইন শৃংখলার যুগ স্মরণ করে থাকে। ১৯৭১ সালের পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলা প্রায় অসম্ভব ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! এখন সে অবস্থার পূর্ণরূপে অবসান ঘটেছে।

ধর্মীয় মহলের লোকেরা নতুন উদ্যোমে কাজ শুরু করেছেন। বরং এখন ক্রমান্বয়ে দেশে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার দাবী স্বাধীনভাবে করা হচ্ছে। দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহ দীর্ঘদিন বিরান থাকার পর এখন পুনরায় আবাদ হয়েছে। তার ঔজ্জল্য পূর্বের মত অবস্থায় ফিরে এসেছে। জায়গায় জায়গায় আগের মত ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিরাট সংখ্যক মুসলমান তাতে অংশগ্রহণ করেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে ভারতের উপর সীমাবদ্ধতা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভারতের তুলনায় বেশি হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! অবস্থার এসব পরিবর্তন সুন্দর ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে। দেশটি রাজনৈতিক দৃঢ়তা লাভ করতে পারলে, ইনশাআল্লাহ! ক্রমান্বয়ে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য হওয়ার আশা করা যায়।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় তৎপরতা এখনও নামেমাত্রই রয়েছে, তবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কালের তুলনায় বর্তমান অবস্থা অনেক ভাল। সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন নামে একটি ধর্ম প্রচার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকার বায়তুল মুকাররম মসজিদের পার্শ্বেই এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত। এর শাখা অফিসসমূহ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তানের 'এদারায়ে তাহকিকাতে ইসলামীয়ার' অনুরূপ। গত এক বছরে প্রতিষ্ঠানটি বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে প্রচার কাজ সম্পাদন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মাত্র এক বছরে ইসলামী বিষয়ে বাংলা এবং ইংরেজীতে লিখিত চারশ'রও অধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। যা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ গতির তুলনায় বিস্ময়কর একটি সংখ্যা।

প্রতিষ্ঠানটি মা'আরিফুল কুরআনের বাংলা তরজমা প্রকাশ করা আরম্ভ করে একটি অতি মূল্যবান কাজ শুরু করেছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও ভাই মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব—সম্পাদক, মাসিক মদীনা, অত্যন্ত একাগ্রতা, পরিশ্রম, উদ্যম ও দক্ষতার সাথে এটি অনুবাদ করছেন। এমন অলৌকিক গতিতে তরজমা করছেন যে, এক বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে পাঁচ ভলিউমের তরজমা সম্পন্ন হয়ে গেছে। তার মধ্যে

এক ভলিউম ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় ভলিউমের মুদ্রণ কাজ চলছে। ঢাকা বিমান বন্দরে নামার পর প্রথম যেই তোহফা এই অধম পায়, তা বাংলা মা'আরিফুল কুরআনের প্রথম ভলিউম।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর জেনারেল অত্যন্ত আবেগপূর্ণ উদ্যোমী মুসলমান। অধমের ঢাকা অবস্থানকালে তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের হলকক্ষে বাংলা মা'আরিফুল কুরআন প্রথম খণ্ডের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করেন। সেই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সিরাজুল হক সাহেবকে সভাপতি হিসেবে এবং আমাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে দাওয়াত করেন। সেখানে নগরীর আলেম, বুদ্ধিজীবি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সাত/আট জন বক্তা মা'আরিফুল কুরআনের পরিচিতির উপর বক্তৃতা প্রদান করেন। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সিরাজুল হক সাহেব, আলিয়া মাদ্রাসার হযরত মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব প্রমুখ জ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ শামিল ছিলেন। অধমও প্রায় একঘন্টা সময় সেই সমাবেশে বক্তব্য রাখি। বক্তব্যের কিছু অংশ ঢাকা রেডিও থেকে সম্প্রচার করা হয়। কোন কোন বন্ধু বলেন ঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত সম্ভবত এটিই প্রথম উর্দূ ভাষণ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

অনুবাদ সম্পর্কে জ্ঞানী–বুদ্ধিজীবিদের সমন্বিত প্রতিক্রিয়া এই যে, বিশুদ্ধতা ও সাবলীলতার দিক থেকে তা মানোত্তীর্ণ একটি তরজমা। এই তরজমা বাংলা ভাষার বিরাট এক শূন্যতাকে পূর্ণ করেছে। আল্লাহ তাআলা সম্মানিত অনুবাদককে আরো অধিক তাওফিকে ভূষিত করেন এবং তাফসীরের অবশিষ্ট ভলিউমগুলোও অতিসত্বর জনসমক্ষে আনার ব্যবস্থা করে দেন। আমীন।

বাংলাদেশের এই সফরে পাঁচ দিন সিলেটে এবং তিনদিন ঢাকায় অতিবাহিত হয়। চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা তাদের সেখানে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে এই দুই শহরের বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই সফরে প্রায় বিশ পঁচিশটি সমাবেশে ভাষণ দানের সুযোগ হয়। সিলেটের কাসিমুল উলূম মাদ্রাসা

ছিল এই সফরের মূল আহবায়ক। আমার ওয়ালিদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) প্রায়ই সিলেট তাশরীফ নিয়ে যেতেন। সিলেটে হযরত শাহজালাল মুজাররাদে ইয়ামানী সাহেব (রহঃ)এর পবিত্র মাযারের নিকটবর্তী দরগাহ মসজিদের ইমাম হযরত মাওলানা আকবর আলী সাহেব (মুদ্দাযিল্লুহুম) হযরত ওয়ালিদ সাহেবের ইচ্ছাতেই কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি শুরুতে একটি মক্তব ছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে তা ধীরে ধীরে বড় একটি মাদ্রাসার রূপ নেয়। হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ)এর দুআ এবং মসজিদের ইমাম হযরত মাওলানা আকবর আলী সাহেব (রহঃ)এর এখলাস এবং মেহনতের বরকতে বর্তমানে মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের বিশিষ্ট মাদ্রাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মাওলানা আকবর আলী সাহেব সেই সব বুযুর্গের অন্যতম, যাঁদের একান্ত সরল, বিনম্র, ফানা ফিল্লাহ, উজ্জ্বল ও নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগে খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁর অন্তরের জ্বালা মাদ্রাসাটিকে অল্প সময়ে অনেক সম্মুখে অগ্রসর করেছে। এই মাদ্রাসায় কয়েকটি বিশেষ সমাবেশ এবং একটি সাধারণ সমাবেশে আমার ভাষণ দানের সুযোগ হয়। সিলেটের আরো একটি মাদ্রাসায় যাই এবং সেখানেও কিছু কথা বলি।

এতদ্ব্যতীত সিলেটের বার কাউন্সিল, মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে ভাষণ দানের সুযোগ হয়। দীর্ঘকাল ধরে সিলেট বুযুর্গদের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে আসছে। সিলেট সর্বপ্রথম হযরত শাহজালাল (রহঃ) সাহেবের বকরত লাভ করে। তিনি এ অঞ্চলের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিজেতা। পরবর্তীকালে এখানকার লোকদের ধর্মীয় আবেগ–স্পৃহা বুযুর্গদেরকে এই ভূখণ্ডে সর্বদা আকর্ষণ করে এসেছে। ফলে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাহুল সাহেব (রহঃ) দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করেন। তাঁর প্রভাব আজো পরিলক্ষিত হয়। তারপর শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (কুদ্দিসা সিররুহু) দীর্ঘদিন পর্যন্ত পবিত্র রমাযান এখানেই অতিবাহিত করেন। তাঁর ফয়েজ–বরকত এখানকার প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে আছে। তারপরে আমার ওয়ালিদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শফী সাহেব (কুদ্দিসা

সিররুহু) প্রায় প্রতি বছরই এখানে তাশরীফ আনতেন। দীর্ঘদিন অবস্থান করতেন। তাঁর ছড়ানো নূর ও ফয়েজ এখানে প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করা যায়। এখন হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব (মুদ্দাযিল্লুহুম) এখানে তাশরীফ আনেন। এ সমস্ত বুযুর্গের তাওয়াজ্জুহের প্রভাবে অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানকার লোকদের মধ্যে ধর্মীয় মন মানসিকতা উঁচুমানের পরিলক্ষিত হয়। এখানকার লোকদের মধ্যে ধর্মের প্রতি বিশেষ টান ও অনুরাগ পাওয়া যায়। পর্দাহীনতা, নগ্নতা ও ধর্মহীনতার অন্যান্য প্রভাব এখানে কম দেখা যায়। কুদরাত এ অঞ্চলকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে নৈসর্গিক রূপ সৌন্দর্যেও সমৃদ্ধ করেছেন। সম্পূর্ণ শহরটি সুরমা নদীর উভয় তীরে সবুজ শ্যামল পাহাড়সমূহের মধ্যে অবস্থিত। শহরের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে লোকেরা একটি বাগানের মধ্যে দিয়ে চলছে বলে অনুভব করে। এ জন্য অধমের সিলেট অবস্থান সর্বদাই এক অপার্থিব ভাব ও প্রশান্তিময় মনে হয়েছে। এবারের সফরেও সেই ভাব ও আনন্দ পূর্ণরূপে লাভ হয়। তবে একটি বেদনা সর্বদাই আমাকে কুরে কুরে খায় যে, পূর্বে এখানে হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ)এর সঙ্গে আসতাম, আর এবার এলাম একা। পূর্বে আসতাম এই দেশের একজন নাগরিক হিসেবে, আর এবার এলাম ভিনদেশী হিসেবে। তবে কালিমায়ে তায়্যিবার বন্ধন সকল মুসলমানকে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের যেই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে—সত্য কথা এই যে, তা এই ইনকিলাবকে অনুভূত হতে দেয়নি। সেখানকার লোকেরা যে একনিষ্ঠ ভালবাসা এবং আবেগপূর্ণ আচরণ করেছেন, তা পূর্বের থেকেও অধিক ছিল।

শেষের তিনদিন কাটে ঢাকায়। সেখানে জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ, মাদ্রাসা নূরিয়া ও ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় যাই। এর মধ্যেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সঙ্গেও একটি বিশেষ বৈঠক হয়। বিচ্ছিন্ন অনেক বন্ধুর সঙ্গে বহু বছর পর সাক্ষাৎ ঘটে। আমার ঢাকা অবস্থানের সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য ছিল হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর (মুদ্দাযিল্লুহুম) সাহেবের দর্শন ও তাঁর সাহচর্য লাভ। তিনি বর্তমানে

এখানে হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব থানবী (কুদ্দিসা সিররুহু)এর একমাত্র খলীফা। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাঁর দাওয়াত ও উপদেশের ফয়েজ সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা একটি দ্বীপ কামরাঙ্গীর চরে তিনি নূরিয়া মাদ্রাসা নামে যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন ক্রমান্বয়ে তা বিশাল এক ফয়েজ কেন্দ্রের রূপ লাভ করেছে। মাদ্রাসাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মাদ্রাসার সাথে সাথে সমৃদ্ধ একটি খানকাও রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মারেফাত পিপাসুগণ এখানে এসে ফয়েজ লাভ করেন। বর্তমানে এই মাদ্রাসার পরিচালক হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)এর ছেলে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ভাই মাওলানা হামীদুল্লাহ সাহেব। দীর্ঘদিন তিনি দারুল উলূম করাচীতে শিক্ষা লাভ করেছেন। মাশাআল্লাহ! তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাদ্রাসার শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক তার ইলম, আমল ও যোগ্যতা বাড়িয়ে দেন।

আমি আমার শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন সাহেব–মুফতী আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা, ঢাকা, এর শুভ আলোচনা না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। তিনি এই অধমের উপর বিরাট বড় স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন যে, অধম ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করার সময় থেকে নিয়ে ফেরা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বাড়ী যাননি। তিনি অনবরত অধমের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তাঁর সাহচর্যকে আমি আল্লাহর বিরাট বড় নেআমত মনে করি, যা কোন প্রকার মেহনত ছাড়াই আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে দীর্ঘ দিন জীবিত রাখেন এবং আমাদেরকে তাঁর ফয়েজ দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

কাতার সীরাত কনফারেন্স

সফর কাল ঃ মুহাররম ১৪০০ হিজরী
মোতাবেক, নভেম্বর ১৯৭৯ ঈসায়ী

কাতার সীরাত কনফারেন্স

গত মাসে কাতারের ধর্মবিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক সীরাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অধম লেখকেরও অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। প্রায় চার বছর পূর্বে এই জাতীয় আন্তর্জাতিক সীরাত কনফারেন্স সর্বপ্রথম পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতি বছর কোন এক ইসলামী দেশে পবিত্র সীরাত বিষয়ে এই জাতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং তুরস্কে এর দ্বিতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং কাতারের এই কনফারেন্স তারই তৃতীয় উদ্যোগ।

আরব উপদ্বীপের মানচিত্রে দৃষ্টি দিলে তার পূর্ব তীরে ছোট একটি দ্বীপ সদৃশ ভূখণ্ড পারস্য উপসাগরে ঝুলতে দেখা যায়। এই উপদ্বীপ সদৃশ ভূখণ্ডই কাতার নামে পরিচিত। এটি আরব উপদ্বীপেরই একটি অংশ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রাযিঃ) একে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। কাতার সেসব সৌভাগ্যবান ভূখণ্ডের অন্যতম যেগুলো ইহ–পরকালের সরদার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনাধীনে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। দুই লক্ষ অধিবাসীর এবং প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইলের এই দেশ প্রথমে সৌদী আরবেরই একটি পশ্চাদপদ অংশ ছিল। তবে এখানে তেল বের হওয়ার পর সে পৃথক রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে। তেল নামের 'তরল স্বর্ণ'–এর বদৌলতে বর্তমানে এখানে আধুনিক নগরায়নের সকল প্রদর্শন জাঁকজমকের সাথে দৃষ্টিগোচর হয়।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সীরাত কনফারেন্স এ দেশেরই রাজধীন দোহাতে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ৫১টি দেশের দুইশত বিশিষ্ট আলেম এবং ইসলামী চিন্তাবিদকে এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। বেশির ভাগ দেশের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এতে অংশগ্রহণ করার ফলে এটি একটি আদর্শ কনফারেন্সের রূপ নেয়। নিমন্ত্রিত ২০০ জনের

মধ্য থেকে যাঁদের সম্মানিত নাম এখন বিশেষ করে স্মরণ হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে জর্দানের শায়েখ মুস্তফা আয–যারকা, সৌদী আরব থেকে শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা, শায়েখ আবদুল মুহাইসিন আল উব্বাদ, শায়েখ মুহাম্মাদ আল মুবারাক, ডঃ মারুফ আদ্ দাওয়ালিবী ও শায়েখ মুহাম্মাদ আলী আল হারকান, কুয়েত থেকে শায়েখ ইউসুফ আল কারযাভী, শায়েখ ইউসুফ হাশেম আর রিফাই, শায়েখ আবদুল্লাহ আল আলী আল মুতাওয়ী। ভারত থেকে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী ও মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবার আবাদী। মরক্কো থেকে ওস্তাদ ওমর বাহা আল আমিরী, শায়েখ আবদুল্লাহ বিন কানুন। আবুধাবী থেকে শায়েখ আবদুল আজিজ আল মুবারাক। সিরিয়া থেকে ডঃ মুহাম্মাদ সাঈদ রমাযান আল বুতী। মিশর থেকে শায়েখ আবদুল মুনঈম আন নামার ও শায়েখ মুহাম্মাদ নাজীব আল মুতই। তিউনিসিয়া থেকে শায়েখ মুহাম্মাদ আল হাবীব ও উস্তাদ মোস্তফা কামাল আত্তারেজী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই কনফারেন্সের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বিরাট সংখ্যক লোক অনেক পরিশ্রম করে তাঁদের প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং কয়েকটি অতি মূল্যবান জ্ঞানশীর্ষক গবেষণা তুলে ধরেন। অন্যথা বর্তমান যুগের কনফারেন্সগুলোতে এই দিকটি দুর্বল হতে চলেছে। কনফারেন্সের মূল প্রতিপাদ্য যদিও পবিত্র সীরাত ছিল, তবে এর মধ্যে সুন্নাত ও হাদীসের শরয়ী গুরুত্বও শামিল করা হয়। সুতরাং এই বিষয়ের উপর উচ্চাঙ্গের জ্ঞানশীর্ষক প্রবন্ধও কনফারেন্সে পেশ করা হয়। যা এই বিষয়ের সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সংযোজনের মর্যাদা রাখে।

কনফারেন্সের সুন্দর ব্যবস্থাপনাও নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য ছিল এবং নিমন্ত্রিতদের সকলকেই এই ব্যাপারে প্রশংসায় মুখরিত দেখা যায়।

কিন্তু এ জাতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সসমূহের যেই দিকটি সর্বদা আমার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে তা এই যে, কনফারেন্সগুলোতে জ্ঞান গবেষণার দিক থেকে যত উন্নতমানের প্রবন্ধই পাঠ করা হোক না কেন এবং যত শক্তিশালী কর্মসূচীই গ্রহণ করা হোক না কেন, আমলের

জগতে এসবের কোন প্রভাব কখনই প্রকাশ পায় না সুধী মহলের এ কাজের দিকে যথোচিত মনোযোগও দেখা যায় না। সুতরাং হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব (রহঃ) কনফারেন্সের উদ্বোধনী অধিবেশনে, যা কাতারের যুবরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল—প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে প্রভাবপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তিনি অত্যন্ত মর্মবেদনা, হৃদয়ের জ্বালা, প্রজ্ঞা ও অলংকার সমৃদ্ধ এই বক্তব্যে এই দিকটির প্রতি যেভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তা উপস্থিত সকলকে সীমাহীন প্রভাবান্বিত করে।

অধমকেও এই কনফারেন্সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছিল। আমি এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রায় প্রস্তুতও করেছিলাম, কিন্তু আমার মানসে এই দিকটি এত প্রবল হয় যে, সেই প্রবন্ধ পেশ না করে আরেকটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ তৈরী করে পেশ করি। নীচে সেই ভাষণের অর্থ পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হামদ ও সালাতে পর।

সুধীমণ্ডলী !

এক্ষণে আমি কোন প্রবন্ধ পাঠ করতে আগ্রহী নই। জ্ঞানসমৃদ্ধ অনেক প্রবন্ধই পঠিত হয়েছে। এমনিভাবে আমি কোন ভাষণ দিতেও প্রয়াসী নই। আলহামদুলিল্লাহ ! অতি মূল্যবান ভাষণও প্রদান করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ ! আমরা এসব প্রবন্ধ ও ভাষণ দ্বারা অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারব।

আমি বরং অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। বিষয়টি যদিও অত্যন্ত পরিস্কার এবং স্বাভাবিক, কিন্তু প্রায়ই তা আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। এটি এমন কোন দুর্লভ জ্ঞান শীর্ষক গবেষণালব্ধ বিষয় নয়, যা বিশিষ্ট আলেমদের সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে। আমি তার যোগ্যও নই। বরং এটি এমন একটি বাস্তব দিক, যা সাধারণতঃ এ ধরনের কনফারেন্সের মুহূর্তে অনেক সময় আমরা

বিস্মৃত হয়ে যাই।

আর তা এই যে, আলহামদুলিল্লাহ! আমরা সকলেই এ বিষয়ে ঈমান রাখি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে যেই শান্তিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তা শুধুমাত্র এ জন্যই সম্ভব হয়েছিলো যে, তখন লোকেরা ইবাদাত ও আখলাক থেকে শুরু করে মুয়ামালাত ও মুয়াশারাত সহ জীবনের প্রতিটি শাখায় ইহ–পরকালের সরদার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাতের অনুসরণের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। এমনিভাবে এ বিষয়েও আমরা একমত যে, আমাদের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতকালে যেই মর্যাদা, সম্মান, উন্নতি ও সচ্ছলতা আমরা লাভ করেছিলাম, তা পুনর্বার ফিরে আনার পন্থাও একমাত্র এই যে, আমাদেরকে আর একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে সত্যিকার অর্থে তাঁর অনুসারী হতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের সকলেরই ঈমান ও ইতেকাদ রয়েছে। কিন্তু এখানে যেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আসে তা এই যে, বর্তমানে আমরা আমাদের এই ঈমান ও ইতেকাদের কোন ফল লাভ করছি না কেন? অথচ সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এই বিশ্বাস ও ইতেকাদের বদৌলতেই সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। এই বিষয়টি সামনে রেখে যখন আমরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করি, তখন দেখতে পাই যে, মূলতঃ এই হাকীকতের উপর তাঁদের ঈমান নিছক জ্ঞানগত বা দর্শন ভিত্তিক ছিল না। বরং এই ঈমান এমনভাবে তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়, যার শিকড় তাঁদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাঁদের গভীর ভক্তি ও ভালবাসা তাঁদের ঈমান বৃক্ষে পানি সিঞ্চন করত। তাই তো ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, সীরাত ও আখলাক, ইবাদত ও মুয়ামালাত এমনকি শেকেল সুরাত ও বেশভূষা সহ জীবনের প্রতিটি শাখায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ছাড়া অন্য কোন তরীকা তাঁদের নিকট মোটেই পছন্দনীয় ছিল না। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের ক্ষেত্রে তাঁদের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এ ব্যাপারে তাঁরা কখনো কারো কোন তিরস্কারকে পরওয়া

করেননি। কোন প্রতিবাদ ও সমালোচনাকে অন্তরে স্থান দেননি। কখনো তাঁরা বিজাতীয়দের ঠাট্টা ও উপহাসের কোনরূপ প্রতিক্রিয়াও গ্রহণ করেননি। তাঁরা কখনো বিধর্মীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বা তাদের মনকে নিজেদের দিকে ধাবিত করার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট থেকে ছোট কোন সুন্নাতকেও ত্যাগ করা বরদাশত করেননি।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন হযরত উসমান বিন আফফান (রাযিঃ) মহানবী (সাঃ)এর দূত হয়ে মক্কার লোকদের নিকট গমন করেন, তখন তারা তাঁর সাথে উপহাস করে এবং কটুকথা বলতে থাকে। পরে হযরত উসমান (রাযিঃ)এর চাচাত ভাই আব্বাস বিন সাঈদ তাঁকে আশ্রয় দেয় এবং ঘোড়ায় বসিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়। সে সময় উসমান (রাযিঃ)এর লুঙ্গি (সুন্নাত মোতাবেক) পায়ের টাখনার উপরে নলার অর্ধেক পর্যন্ত ঝুলানো ছিল। (কুরায়েশের সরদারগণ এভাবে লুঙ্গি পরিধান করাকে খারাপ মনে করত) তাই তাঁর চাচাত ভাই তাঁকে বললেন ঃ ভাই! আপনাকে এত বিনয়ী দেখা যাচ্ছে কেন? আপনি আপনার লুঙ্গি একটু নিচে ঝুলিয়ে দেন। (যেন কুরায়শ নেতারা আপনাকে তুচ্ছ মনে না করে।) বাহ্যত তার এ পরামর্শ হিতাকাংখিতা এবং পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদা অনুপাতেই ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রাযিঃ) এতে সম্মত হননি। বরং তার উত্তরে তিনি বলেন ঃ আমাদের মনিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লুঙ্গি এমনই হয়। (তাই আমি এই পন্থা ছাড়তে পারব না।)

(কানযুল উম্মাল পৃঃ ৫৬, খঃ ৮)

এমনিভাবে হাফেয আবু নাঈম (রহঃ) এবং হাফেয ইবনে মন্দাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত জুছামা বিন কিনানা (রাযিঃ)কে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর নিকট দূত বানিয়ে পাঠান। তিনি হিরাক্লিয়াসের দরবারের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি বেখেয়ালে একটি চেয়ারে বসে পড়ি। কিসের উপর বসেছি তা আমার জানা ছিল না। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম যে, স্বর্ণের চেয়ারে বসে আছি। কাজেই চেয়ারের উপর আমার দৃষ্টি পড়তেই আমি চেয়ার থেকে নেমে

যাই। হিরাক্লিয়াস তা দেখে হাসতে লাগল এবং বলল ঃ আমি তো (এই চেয়ারে বসিয়ে) তোমাকে সম্মান করেছি। তুমি নেমে গেলে কেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের চেয়ারে বসতে নিষেধ করতে শুনেছি।

(কানযুল উম্মাল পৃঃ ২২৭, খঃ ১৬)

এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আমাদের ইতিহাস ইত্তেবায়ে সুন্নাতের এমন পবিত্র দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এই জাতীয় ঘটনা দ্বারা যে সত্যটি আমাদের সামনে ফুটে উঠে তা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন পরিপূর্ণ অনুকরণ করে দেখিয়েছেন, যার মধ্যে প্রবৃত্তির দখল ছিল না। বিকৃতি সাধন বা ব্যাখ্যা প্রদানেরও সুযোগ ছিল না। এ ব্যাপারে কাউকে ভয় পাওয়ার চিন্তাও ছিল না এবং কাফের ও মুশরিকদের ঠাট্টা ও উপহাসের প্রতিও কর্ণপাত করতেন না।

পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এই যে, মৌখিকভাবে যদিও আমাদের ঈমান রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ধরাপৃষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট সীরাত। কিন্তু কার্যতঃ আমরা তাঁর সুন্নাতের মধ্যে এভাবে পার্থক্য শুরু করেছি যে, যে সুন্নাত আমাদের মনঃপুত হয়, তাতো আমরা গ্রহণ করি কিন্তু যে সুন্নাতের উপর আমল করতে মন চায় না, তা কখনো এ কথা বলে ছেড়ে দেই যে, এগুলো তো তাঁর সুন্নাতে আদিয়া (অভ্যাসগত সুন্নত) ছিল, যার অনুসরণ আমাদের উপর ওয়াজিব নয়। যেন আমরা তাঁর আদত (অভ্যাস) থেকে উৎকৃষ্ট অন্য কোন আদত (অভ্যাস) পেয়ে গেছি, যে কারণে আমরা তা গ্রহণ করছি। নাউজুবিল্লাহ! সুন্নাত পরিহারের জন্য কখনো বা এই বাহানা বানাই যে, অমুক সুন্নাতটি আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থার প্রেক্ষাপটে উপযোগী নয়। কখনো বা এই ব্যাখ্যা করি যে, এই সুন্নাত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে শরীয়তসম্মত ছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের জামানায় তা শরীয়তসিদ্ধ নয়।

আমরা সকাল সন্ধ্যা এই জাতীয় ব্যাখ্যা প্রদান করছি। আর তা এ কথারই প্রমাণ যে, আমাদের ঈমানের মধ্যে রাসূলের ভালবাসার কমতি

রয়েছে। আর এটিই সেই বিরাট ও সুস্পষ্ট ব্যবধান, যা আমাদের মধ্যে আর সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের মধ্যে বিরাজ করছে।

তাই প্রথম যুগে হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম ইত্তেবায়ে সুন্নাতের বরকতে যেই সম্মান, মর্যাদা, উৎকর্ষতা ও উন্নতি লাভ করেছিলেন সত্যিই যদি আমরা তা লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও সেভাবেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে, যেভাবে করে দেখিয়েছেন হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম। তাঁকে অনুসরণ করার মধ্যে কোনরূপ ব্যাখ্যা–বিকৃতির নামগন্ধও থাকবে না। এমনিভাবে নিজের নফসের খাহেশাত পুরা করা বা শত্রুর উপহাসের ভয় থাকবে না। কারণ, আল্লাহর শপথ! আকাশচুম্বী এসব প্রাসাদ আমাদের মর্যাদার পুঁজি হতে পারে না এবং বিলাসবহুল এসব ভবন, চাকচিক্যময় পোশাক ও সাজ–সরঞ্জাম আমাদের গর্বের বস্তু হতে পারে না। আমাদের ইজ্জত একমাত্র নবীয়ে উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযথ অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত। যিনি একদিন আহার করতেন এবং একদিন উপোষ থাকতেন। যিনি চাটাইয়ে ঘুমাতেন। যিনি মসজিদ নির্মাণের কাজে নিজের পবিত্র হাতে ইট বহন করতেন। যে পর্যন্ত আমরা সেই উম্মী নবীর রঙ্গে নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে রাঙ্গানোর চেষ্টা না করব, সে পর্যন্ত আমরা কোন সম্মান ও সফলতা লাভ করতে পারব না।

পবিত্র ও মহিমান্বিত এই কনফারেন্স যেখানে সীরাত ও সুন্নাতের নামে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিগণ একত্র হয়েছেন, আমাদের নিকট এই দাবী জানায় যে, আমরা উপরোক্ত মাপকাঠিতে নিজেদের হিসাব নেই। তারপর সেই সব পন্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি, যেগুলো দ্বারা মুসলমানদের অন্তরে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের এমন ভালবাসা জন্মাবে, যা বর্তমান থাকতে তারা নফসের খাহেশাত বা অনৈসলামী মতাদর্শ দ্বারা প্রতারিত ও প্রভাবিত হবে না। বিধায় আমার প্রস্তাব এই যে, আজকের কনফারেন্স পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও সংকল্পের সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত কর্মসূচী গ্রহণ করবে—

১. আজকের কনফারেন্স সকল মুসলমানের নিকট সাধারণভাবে এবং জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি ও ইসলামের মুবাল্লিগদের নিকট বিশেষভাবে আবেদন

করছে যে, তারা নিজেদের জীবনে, জীবন পদ্ধতিতে ও সামাজিকতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে। এ ব্যাপারে নিজেরা যত্নবান হবে, যাতে করে তাদের জীবন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের শ্রেষ্ঠতম বাস্তব আদর্শে পরিণত হয়।

২. আজকের কনফারেন্স প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের মুসলমানদের নিকট সুপারিশ করছে যে, তারা নিজেদের চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্য থেকে—আধা ঘন্টা হলেও সীরাতে তাইয়্যেবার অধ্যয়নে ব্যয় করবে। সে সময় তারা নিজেরা সীরাত অধ্যয়ন করবে এবং পরিবারের অন্যান্যদেরকেও তা পড়ে শুনাবে এবং প্রত্যহ নিজের হিসাব নিবে যে, আজকে সীরাত অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।

৩. আজকের কনফারেন্স সকল ইসলামী দেশের সরকারের নিকট আপীল করছে যে, সীরাতে নববীকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে অবশ্য পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করবে এবং প্রচারকেন্দ্রগুলোতে দৈনিক সীরাত ও সুন্নাতের শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করবে।

৪. আজকের কনফারেন্স সকল জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবির নিকট আপীল করছে যে, তাঁরা তাঁদের লেখনী ও ভাষণের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সহজ সাবলীল উপায়ে সীরাত ও সুন্নাতের প্রচার প্রসার করবেন। কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে বিকৃতি করে তাকে আধুনিক ও অনৈসলামী মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা না করে সীরাত ও সুন্নাতকে তার বিশুদ্ধ ও আসল রূপে মুসলমানদের জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য আলোকবর্তিকা বানাবেন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

চীন ভ্রমণ

সফরকাল ঃ নভেম্বর ১৯৮৫ ঈসায়ী

دشت میں، دامنِ کہسار میں، میدان میں ہے
بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے
چین کے شہر، مراکش کے بیابان میں ہے
اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے
چشمِ اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے
رفعتِ شانِ رَفَعنَا لَكَ ذِكرَكَ دیکھے

বনে–জঙ্গলে পাহাড়ী উপত্যকায় ও ময়দানে,
সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গের কোলে ও প্রচণ্ড তুফানে,
চীনের শহরে, মারাকাশের মরুভূমিতে
এবং মুসলমানের ঈমানে লুকায়িত সযত্নে।
দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি এ দৃশ্য চিরদিন দেখবে,
رفعنا لك ذكرك
(তোমার আলোচনাকে আমি সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছি।)
–এর চির উন্নত শান চিরদিন দেখবে।

চীন ভ্রমণ

যখন থেকে চীন ধর্মীয় ব্যাপারে তার কঠোর নীতির পরিবর্তে শিথিল নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে কিছু কিছু ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে, তখন থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রের সাথে চীনের মুসলমানদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। চীনের মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় প্রতি বছর হজ্জে যেতে শুরু করেছে। এ বছর তো চীনের দুই সহস্র মুসলমান এই পবিত্র ফরয আদায় করেছেন। তাদের সফরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার সৌভাগ্য পাকিস্তানের হয়েছে।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মুসলিম দেশসমূহ থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল চীনে পৌঁছা এবং ধর্মীয় বিষয়সমূহে সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতার পথ অন্বেষণ করা শুধু উচিতই নয় বরং অতি জরুরীও বটে। এ উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান সরকার কয়েক দফা আলেমদের প্রতিনিধি দল চীনে প্রেরণ করেছে এবং চীনের মুসলমানদের প্রতিনিধি দলও কয়েকবার পাকিস্তান এসেছে।

এ বছর পাকিস্তান সরকার অধমের নেতৃত্বে ছোট একটি প্রতিনিধি দল চীনে পাঠানোর ইচ্ছা করে। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হুসাইন নাঈমী সাহেব, মুহতামিম, জামিয়া নাইমীয়া, লাহোর। মাওলানা ফখরুল হাসান কারারবী (পেশওয়ার) এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী মাহফুজ আহমাদ সাহেব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩রা নভেম্বর রোজ রবিবার ভোর সাতটায় আমরা পি.আই.এ যোগে চীন অভিমুখে রওয়ানা করি। এদিকে এটা আমার প্রথম সফর ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই খুব আগ্রহ উৎসুক্য নিয়ে ভ্রমণের সূচনা হয়। বর্তমানে ইসলামাবাদ থেকে গমনকারী বিমানসমূহ পাকিস্তানের উত্তরে দীর্ঘ পর্বতসারি অতিক্রম করে সিংকিয়াং এর পথে পিকিং যায়। সুতরাং ইসলামাবাদের মারাগালা পাহাড় অতিক্রম করতেই দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত

পর্বতমালার বরফাচ্ছাদিত চূড়াসমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। পাহাড় থেকে আরও উপরে ওঠার জন্য বিমান দুই দুইবার ইসলামাবাদ শহরের উপর চক্কর কাটে। এতদসত্ত্বেও তুষারাবৃত পর্বতমালার উপর দিয়ে অতিক্রমকালে তার দূরত্ব খুব অল্প মনে হচ্ছিল। প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট উড়ার পর ডানদিকে খুব উঁচু একটি চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। আশেপাশের সকল চূড়া থেকে এটিকে অনেক উঁচু দেখাচ্ছিল। পাইলট ঘোষণা করলেন, এটা নাগা পর্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা ২৬ হাজার ফুট এবং বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে এটি ষষ্ঠ। বিমান প্রায় ছুঁই ছুঁই করতে করতে এর উপর দিয়ে অতিক্রম করে। কয়েক মুহূর্ত পর বিমানের বাম দিকে পর্বতেঘেরা গিলগিত শহর দৃষ্টিগোচর হয়। তার কয়েক মিনিট পরই পাইলট ঘোষণা করে যে, এখন বিমান বিশ্বের বিখ্যাত পর্বতচূড়া কে–২ এর একেবারে বরাবর অবস্থান অতিক্রম করছে। বিমানের পূর্ব ও ডান দিকে তিন কোণা বিশিষ্ট গগনছোয়া একটি শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। যাকে পর্বতের এই সাগরে মর্যাদাশালী উপদ্বীপের মত বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী দেখাচ্ছিল। এটি কারাকোরাম পর্বতরাজীর সেই শৃঙ্গ যাকে গডউইন অষ্টিনও বলা হয়। যা ২৯ হাজার ফুট উঁচু হওয়ার কারণে মাউন্ট এভারেষ্টের পর বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।

আল্লাহ তাআলা পাকিস্তানের উত্তরে গগনছোয়া পর্বতমালার যেই সুন্দর প্রাচীর নির্মাণ করেছেন, তাকে এভাবে প্রত্যক্ষ করার এই প্রথম সুযোগ হল। এ সকল পর্বত এবং তার উপর আচ্ছাদিত দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত শুভ্র তুষার চাদরের দৃশ্য বিমান থেকে এত মনোরম লাগছিল যে, দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

[অর্থ ঃ "কত না মহান সেই সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা।"]

ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। রূপ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার ছড়ানো ছাড়াও এই পর্বতরাজি দেশের যেই প্রতিরক্ষামূলক সেবা করছে তার ফলে মরহুম ইকবালের কবিতা স্মরণ হয়—

اے ہمالہ! اے فصیلِ کشورِ ہندوستاں چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں
تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں تو جواں ہے گردشِ شام و سحر کے درمیاں
برف نے باندھی ہے دستارِ فضیلت تیرے سر خندہ زن ہے جو کلاہِ مہرِ عالمتاب پر

অর্থ ঃ হে হিমালয়! ভারতবর্ষের বীরত্বের হে নগর রক্ষক প্রাচীর!
আকাশ নত হয়ে তব ললাটে চুম্বন করে!
তোমাতে বার্ধক্যের কোন চিহ্ন ফুটে উঠেনি।
তুমি চির যৌবনা সকাল সাঝের আবর্তনের মাঝে।
বরফ তোমার মস্তকে মর্যাদার পাগড়ি বেঁধে দিয়েছে,
যা বিশ্বে আলোক সৃষ্টিকারী সূর্যের টুপি কে দেখে হাসতে থাকে।

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট উড্ডয়নের পর এই পর্বতমালার ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছে পাইলট ঘোষণা করেন যে, এখন আমরা পাকিস্তান ও চীনের সীমান্তে এসে পৌঁছেছি। ঘোষণার সাথে সাথে বিমান চীনের সর্ববৃহৎ প্রদেশ সিংকিয়াং (চীনের তুরস্ক)এ প্রবেশ করে।

চীন আয়তনের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কানাডার পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। যার সর্বমোট আয়তন ৯৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। জনবসতির দিক থেকে এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দেশ। যার বসতি ১০০ কোটিরও অধিক। এর সীমান্ত পশ্চিমে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, নেপাল, সিকিম ও ভুটানের সঙ্গে যুক্ত, দক্ষিণে বার্মা, লাউস ও ভিয়েতনামের সঙ্গে, পূর্বে কোরিয়া, উত্তরে মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিশেছে।

এর সম্পূর্ণ ভূখণ্ড বড় বিচিত্র এবং নানারকম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে গগনচুম্বী পর্বতসমূহের দীর্ঘ সারি রয়েছে, বৃক্ষলতাশূন্য মরুপ্রান্তর রয়েছে এবং নয়নাভিরাম সবুজ শ্যামল ভূমিও রয়েছে। পিকিং পর্যন্ত ভ্রমণকালে কিছুদূর পর এ সকল বিচিত্র ভূখণ্ড দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। কারাকোরাম পর্বতমালার ধারা শেষ হতেই এমন ঘাসশূন্য পাথুরে

ভূমি শুরু হয়, যেখানে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। এর পর পুনরায় বরফাচ্ছাদিত পর্বতসমূহের এক দীর্ঘ ধারা সামনে আসে এবং চড়াই উৎরাইয়ের এই ধারা পিকিং পৌঁছা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সম্ভবত এ কারণেই বলা হয় যে, যদি পশ্চিম দিক থেকে পূর্বের উপকূল অঞ্চল পর্যন্ত চীনের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড একসাথে দেখা সম্ভব হতো, তাহলে একে সিঁড়ির ধাপের মত নীচের দিকে নামতে দেখা যেত।

প্রায় ছয় ঘন্টা উড্ডয়নের পর বিমান বেইজিং এর বিমান বন্দরে যখন অবতরণ করল, এখানে তখন বিকাল চারটা। (চীনের সময় পাকিস্তান থেকে তিন ঘন্টা এগিয়ে)। বিমান থেকে বের হতেই বিমান বন্দরের লাউঞ্জে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রধান অফিসারগণ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানায়। আরেকটি লাউঞ্জ অতিক্রম করার পর চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ এবং চীনের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহ–সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষমান দেখতে পাই। চীনে আমাদের আতিথেয়তা করছিল চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশন, ভিআইপি লাউঞ্জে সেই সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে কিছু সময় কুশলাদি বিনিময়ে কাটে। আমরা সেখানেই আছর নামায আদায় করার পর বিমান বন্দর থেকে রওয়ানা করি। একটি হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যা এখানে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহল' নামে প্রসিদ্ধ। এর দশতলা বিশিষ্ট সুউচ্চ ভবনটি বেইজিংয়ের সর্ববৃহৎ প্রধান সড়ক চাংইং ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখানে পৌঁছতে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। নামায ও রাতের খাবারের পর চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশনের ভদ্র মহোদয়গণ চীনে অবস্থানকালে আমাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন। খুব বেশি ক্লান্ত ছিলাম, তাই অতিসত্বর বিছানায় চলে যাই। সপ্তম তলায় অবস্থিত এ কক্ষের বাতায়নে পিকিং এর সাধারণ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে বিরাজ করছিল। সুদৃঢ় ও বিস্তৃত উঁচু উঁচু দালানসমূহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কিন্তু তাতে আলোকমালার সেই জৌলুস—যার দ্বারা বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেক উন্নত শহর বরং উন্নয়নশীল শহরও জাঁকজমকপূর্ণ দেখা যায়, এখানে তার চিহ্ন নেই। সমগ্র শহরে কোথাও একটি নিয়ন সাইনও ছিল না। আলোকমালার আলোকসজ্জা তালাশ

করেও চোখে পড়ছিল না। সড়ক ও ইমারতসমূহে শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুপাতে বাল্ব জ্বলছিল, যা করাচীর উজ্জ্বল আলোকমালার তুলনায় অস্তিত্বহীন বলে মনে হচ্ছিল এবং ঝলমলে আলোয় অভ্যস্থ দৃষ্টির নিকট তা খুব অপরিচিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু বিবেকের বিচার এই ছিল যে, যেসব দেশ বিদ্যুৎশক্তির স্বল্পতায় আক্রান্ত, তাদের জন্য নিজেদের স্বল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তিকে সাজসজ্জা ও প্রদর্শনীর কাজে ব্যয় করার কোন অধিকার থাকে না। চীন যদি বিবেকের এই সিদ্ধান্তকে আবেগের উপর স্থান দিয়ে থাকে তাহলে এটা কোন আপত্তিকর বিষয় নয়, বরং প্রশংসার যোগ্য। পুনর্বিবেচনা করতে হলে, আমাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেই করা উচিত। আমরা সারা বছর লোড–শেডিংয়ের ও অনেক সময়ই বিদ্যুৎ নষ্ট হওয়ার কষ্ট সহ্য করি, তবুও দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রদর্শনী ও আলোকসজ্জার পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলছি।

ভোরে নাস্তা খাওয়ার পর আমাদের মেজবান সংগঠন 'চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশন'এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে আমাদের ভ্রমণের সূচনা হয়। এটি সারা দেশের চীনা মুসলমানদের বহু লক্ষ্য কেন্দ্রিক একটি সংগঠন, যা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে যাচ্ছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ব্যক্ত করা হয় ঃ

১. ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সাহায্য করা।

২. উৎকৃষ্ট ইসলামী ঐতিহ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ইসলামের আলোকে দেশপ্রেম প্রবণতার প্রসার ঘটানো।

৪. আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো।

৫. ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক কর্মসম্পাদন করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক উৎস ও উপাদান সন্নিবেশিত করা।

৬. বিশ্বের মুসলমানদের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা ও বন্ধুত্বের বিস্তার ঘটানো।

এই সংগঠন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর ব্যয়সমূহ চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াও মুসলমানদের ব্যক্তিগত চাঁদা এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠনের দান ইত্যাদি থেকে নির্বাহ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি আলহাজ মুহাম্মাদ আলী ট্রানজয়। তার দুর্বলতা ও

অসুস্থতাহেতু সংগঠনের অধিকাংশ কার্যাবলী সহ–সভাপতি আলহাজ মুহাম্মাদ ইলিয়াছ সম্পাদন করে থাকেন। তাঁর চীনা নাম শীন যিয়াযি। সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ ১৫০ সদস্য বিশিষ্ট, যার মধ্য থেকে নির্বাচিত ৪০ সদস্য কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সম্মিলিতভাবে চীনা মুসলমানদের দেশব্যাপী এটি একক সংগঠন, যা মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে থাকে। চীনে বিরাট সংখ্যক মুসলিম জনবসতি রয়েছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে চিয়াং কাইশেক এর শাসনাকালে যে আদমশুমারী হয়েছিল, তার ভিত্তিতে এখানকার মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ কোটি বলা হয়। তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আদমশুমারীতে যেহেতু ধর্মের জন্য পৃথক কোন ঘর ছিল না, এজন্য মুসলিম জনসংখ্যা পৃথকভাবে গণনা করার নির্ভরযোগ্য কোন পথ নেই। বিপ্লবের পর সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আদমশুমারী হয়। চীনে ৫৬টি সম্প্রদায় পাওয়া যায়। যার মধ্যে হান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা মোট জনবসতির ৯৩.৩% বলে বলা হয়। এ সম্প্রদায়েও বিরাট সংখ্যক মুসলমান আছে। তবে বেশির ভাগ মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। কিগওয়ার, কাজাক, তাজিক, হুই, তাতার, কারগীজ, কংশিয়াং, সালার ও পাওয়ান সম্প্রদায়েও বিরাট সংখ্যক মুসলমান রয়েছে। এর মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়, যেমন—কিগওয়ার, কাজাক ও তাজিক ইত্যাদিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মুসলিম জনসংখ্যার অনুমান সেসব সম্প্রদায়ের মুসলমানদের আনুপাতিক হারে করা হয়। বর্তমানে চীনে মুসলমানদের মোট সংখ্যা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ বলা হয়ে থাকে।

মুসলিম জনসংখ্যার ব্যাপারে এই বিবৃতি নিঃসন্দেহে মারাত্মক ভুল ও নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীতে যদি মুসলিম জনসংখ্যা ৫ কোটি হয়ে থাকে, তারপর চল্লিশের অধিক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত সংখ্যা থেকে সাড়ে তিন কোটি ঘাটতি হওয়া কিরূপে সম্ভব?

চীন ইসলামের আলোকে প্রথম হিজরী শতাব্দীতেই উদ্ভাসিত হয়েছিল। বলা হয় যে, হযরত উসমান (রাযিঃ)এর শাসনকালেই

কয়েকজন ধর্ম প্রচারক চীনের পূর্ব উপকূলে পৌঁছে যান। পূর্ব চীনের একটি শহর কুয়াংচুতে একটি মাজার রয়েছে, সেটিকে হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাযিঃ)এর মাজার বলে বলা হয়। এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

পরবর্তীতেও ইরানের মুসলমান বণিকগণ কাশগড়ের পথে এবং আরব মুসলমানগণ সমুদ্রপথে কুয়াং চু ও অন্যান্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বন্দরসমূহে আসতে থাকেন এবং ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। চীনে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমবার সেনাভিযান হয়েছিল ওলীদ বিন আবদুল মালিকের শাসনকালে উতায়বা বিন মুসলিম বাহেলীর নেতৃত্বে। কিন্তু চীনের দক্ষিণ পশ্চিমের অল্প কিছু এলাকায় অগ্রসর হওয়ার পর তাঁকে কেন্দ্র থেকে ডেকে পাঠানো হয়। তাই চীনে ইসলামের প্রচার প্রসার পুরোটাই সে সকল বণিক মুসলমান ও ধর্ম প্রচারকদের কৃতিত্ব, যাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগের প্রেরণার বদৌলতে আজ বহু শতাব্দী পরও এখানে এত সংখ্যক মুসলমান আবাদ রয়েছে।

চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির শাসনকালে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' নামে যে আন্দোলন হয়েছে, তাতে ধর্মের বিরুদ্ধে খুব কঠোরতা করা হয়। মুসলমানদের মসজিদসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শিক্ষা কেন্দ্রের বিলুপ্তি ঘটানো হয় এবং ইসলামী নিদর্শনসমূহ মিটিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। মুসলমানদের জন্য এ সময়টি খুব কঠিন ছিল। বলা বাহুল্য যে, এ যুগে চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশন এর ন্যায় সংগঠনের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করার সুযোগই ছিল না। কিন্তু তার পরের কয়েক বছরে (১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের পর) চীন সরকার তার পলিসি পরিবর্তন করে। রাষ্ট্রীয় আইনে ধর্মের উপর আমল করার স্বাধীনতা দেয়া হয়। যে সকল মসজিদ বন্ধ এবং বিরান পড়েছিল, তা শুধু খুলেই দেয়া হয়নি, বরং সেগুলো মেরামত ও নতুন করে নির্মাণ করা হয়। শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ তাদের কর্মসম্পাদনের মোটামুটি অনুমতি পেয়েছে, তখন থেকে এই এসোসিয়েশন দেশে ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

সংগঠনের প্রধান কার্যালয় বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। এখানে সংগঠনের

সভাপতি, সহ–সভাপতি ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ আমাদেরকে স্বাগত জানান। চীনের মুসলমানদের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করার সময় তারা বলেন যে, বেইজিং এ ১ লক্ষ ৮০ হাজার মুসলমান রয়েছে এবং পুরা শহরে ৪৬টি মসজিদ রয়েছে। নতুন আইন পাশ করার পর মুসলমানরা স্বাধীনভাবে এখানে এবাদত করে থাকে। মুসলমানদের রেস্তোরাঁ ও জবেহখানা পৃথক। বিমান ও রেলওয়েগুলোতেও তাদের জন্য হালাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বরং বেইজিং থেকে কানচুগামী একটি ট্রেনে শুধুমাত্র মুসলমানদের খাবারই পরিবেশন করা হয়। কেননা, সে অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ আমাদেরকে সংগঠন থেকে প্রকাশিত তাফসীরে জালালাইন ও শরহুল বেকায়ার কপি হাদিয়া দেন। সংগঠন তার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পাঠদানের লক্ষ্যে গ্রন্থগুলো প্রকাশ করেছে। তাফসীরে জালালাইন মিসরীয় ছাপার ফটোকপি এবং শরহে বেকায়া ভারতীয় কপির ফটোকপি। এতে হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেব লাখনভী (কুঃ সিঃ)এর টীকা 'ওমদাতুর রেওয়ায়া'ও রয়েছে। উভয় কিতাবের মান উৎকৃষ্ট। যা দেখে হৃদয় আনন্দে ভরে যায়।

তারপর আমরা এই ভবনের মাদ্রাসা অংশে যাই। মাদ্রাসায় ৫ বছর মেয়াদী পাঠ্যক্রমে পাঠদান করা হয়। যার মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, আকাঈদ ও ইসলামী ইতিহাস শিক্ষাদান করা হয়। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে যাই। একটি কক্ষে আরবী ব্যাকরণ পড়ানো হচ্ছিল। সেখানে আনুমানিক বিশ পঁচিশজন ছাত্র ছিল। আমরা ছাত্রদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করি। তাদের প্রদত্ত উত্তরে অনুমান হয় যে, এখানকার শিক্ষার মান বেশ উন্নত। একটি শ্রেণীতে শরহে বেকায়া কিতাবের 'কিতাবুততালাক' পড়ানো হচ্ছিল। সেখানেও প্রায় বিশজন ছাত্র ছিল।

চীনের মত দেশে যেখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধর্মকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং যেখানে ইলমে দ্বীনের ধারক বাহকদের সম্মুখে অর্থনৈতিক কোন ভবিষ্যত নেই, সেখানে এতসংখ্যক ছাত্র মাদ্রাসামুখী হওয়াও বিরাট গনিমত। আমাদেরকে জানানো হল যে, সংগঠন তাদের

পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রদেরকে অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রের তুলনায় বেশি ভাতা প্রদান করে থাকে। কারণ, বর্তমানে চীনা মুসলমানদের সামনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এই যে, সারা দেশের তেইশ হাজার মসজিদের বর্তমান ইমামগণ বেশির ভাগই বয়ঃবৃদ্ধ। এখন তাঁদের স্থান পূরণের জন্য বিরাট সংখ্যক তরুণ-যুবকের প্রয়োজন।

এই সংগঠনের আওতায় এই ভবনেই একটি বিপনীকেন্দ্র রয়েছে। এতে কুরআন শরীফ, ধর্মীয় গ্রন্থ ও মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মীয় প্রয়োজনীয় জিনিস যথা—জায়নামায, টুপি, তাসবীহ, হিজরী সনের কেলেণ্ডার, মেয়েদের ওড়না প্রভৃতি বিক্রয় করা হয়। এখান থেকে চীনা ও দেগওয়ার ভাষায় 'চীনা মুসলমান' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

বেইজিং এর নিউজে মসজিদ

এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনের পর আমরা নিউজে জামে মসজিদে যাই। এটি বেইজিং এর সর্ব প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ মসজিদ। যে মহল্লায় এই মসজিদ অবস্থিত তাকে নিউজে ষ্ট্রীট বলা হয়। এখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। চীনা ভাষায় 'নিউজে' গাভীকে বলা হয়। আর মুসলমানগণ যেহেতু বেশির ভাগ গাভীর গোশত খায় এজন্য এই সড়ক ও মহল্লার নাম 'নিউজে' রাখা হয়েছে।

মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদ সংলগ্ন একটি হলকক্ষে আমাদের অভ্যর্থনা জানান এবং আপ্যায়ন করান। অতঃপর মসজিদের গ্রন্থাগার দেখান। যার মধ্যে কুরআন শরীফ ও অন্যান্য আরবী, ফারসী গ্রন্থের দুর্লভ পাণ্ডুলিপি রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সাতশত বছরের পুরানো একটি কপি রয়েছে। ফেকাহ ও তাসাওউফের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। তাসাওউফ সংক্রান্ত এমন কিছু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখলাম, যেগুলো ইতিপূর্বে ছাপা অবস্থায় দেখতে পাইনি।

তারপর আমরা মসজিদে যাই। বলা হয় যে, মসজিদটি এক সহস্র বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে চীনের মুং বংশের শাসনকালে এটি সম্প্রসারিত ও পুনঃনির্মাণ করা হয়। মসজিদের বর্তমান

অবকাঠামো সেই সময় থেকে চলে আসছে। সে যুগের বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতির এটি শাহী কর্ম। মসজিদের আভ্যন্তরীণ হল পুরোটাই কাঠ দ্বারা নির্মিত। কাঠের উপর খুব সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী রং লাগানো হয়েছে। রং এর উপর স্বর্ণের পানির কাজ করা হয়েছে। বলা হয় যে, এতে আড়াই কিলোগ্রাম স্বর্ণ খরচ হয়েছে। কাঠনির্মিত এই ভবনটি এত মজবুত ও স্থায়ী যে, প্রায় পাঁচশ' বছর অতিক্রম করার পরও তার জাঁকজমকে কোন পার্থক্য হয়নি। বরং এই দীর্ঘ সময়কালে পাথর নির্মিত বহু ভবন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে, কিন্তু এই ভবনটি ভূমিকম্পেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর এই মসজিদকে বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ লক্ষ ইয়েন ব্যয় করে তা পুনরায় মেরামত করা হয় এবং ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে নামাযীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ইমাম সাহেব বললেন ঃ এখানে পাঁচওয়াক্ত নামাযে ৮০ থেকে ২০০ লোক হয়। জুমু'আর নামাযে ৬০০ এবং দুই ঈদের নামাযে ২০০০ পর্যন্ত লোক নামায পড়ে। দৈনন্দিন নামাযীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই মসজিদের সীমানায় দু'জন বুযুর্গের মাযার রয়েছে। একটি মাযারের ফলকে প্রাচীন আরবী লিপিতে লেখা আছে—এটা শায়েখ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল বুরছানী আল কাজবীনীর কবর। ৬৭৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। অপরজন শায়েখ আলী বিন আল কাযী ইমাদুদ্দীন আল বুখারী, যাঁর মৃত্যু হয় ৬৮২ হিজরীতে। বুযুর্গদ্বয়ের জীবনী সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনি, তবে মাযারের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে 'মা ওয়ারয়ুন নাহারের' আলেমগণ এখানে তাবলীগের উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন। এটা সেসব বুযুর্গের পরিশ্রম ও ত্যাগের ফল যে, ইসলামের কেন্দ্রসমূহ থেকে সুদূরের এই অঞ্চলে এত বিরাট সংখ্যক মুসলমান আজও তাওহীদের কালিমা বক্ষে ধারণ করে সকল সমস্যার মোকাবেলা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁদেরকে মর্যাদাশালী করুন। বিকাল সাড়ে তিনটায় আমরা চীনের পাকিস্তানী দূতাবাসে যাই। চীনের পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আনোয়ার ভাট্টির সাথে ফলপ্রসূ সাক্ষাত হয়। তিনি এখানে সাড়ে তিন বছর যাবৎ রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করছেন।

একথা জেনে খুব আনন্দিত হলাম যে, মাশাআল্লাহ! তিনি চীনের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়েছেন। চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত আছেন। দূতাবাস ভবনও মাশাআল্লাহ! অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও সুদৃশ্য। ভবনটি একটি চুক্তির ভিত্তিতে পাকিস্তানী নকশা অনুযায়ী চীন সরকার নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করে। প্রতিদানে পাকিস্তান সরকারও ইসলামাবাদে নিজ ব্যয়ে চীনা দূতাবাস নির্মাণ করে। দূতাবাসে একটি মসজিদও রয়েছে, তাতে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়।

বিকাল চারটায় চীনা মুসলমানদের এক বর্ষিয়ান নেতা জনাব বুরহান শহীদী সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে সাক্ষাত হয়। তাঁর বয়স ৯২ বছর। তিনি চীনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং চীনা ইসলামিক এসোসিয়েশনের অতিরিক্ত চেয়ারম্যান। তিনি দিগওয়ার বংশোদ্ভূত। তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য দিগওয়ারী থেকে চীনা ভাষায় এবং চীনা ভাষা থেকে উর্দু ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন হয়। তবে বহুল প্রচলিত কিছু বাক্য আরবীতেও তিনি বলেন। তাঁকে এখানকার মুসলমানরাই শুধু শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না বরং পুরা দেশের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ায় সারাদেশে তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদাও অনেক ঊর্ধ্বে।

রাতে আমাদের হোটেলেরই একটি ইসলামী রেস্তোরাঁতে আমাদের মেজবান এসোসিয়েশন প্রতিনিধি দলের সম্মানে নৈশ ভোজের আয়োজন করে। এসোসিয়েশনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং বেইজিং এর বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ ছাড়াও পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব আনোয়ার ভাট্টি ও দূতাবাসের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ এবং বুরহান শহীদী সাহেব এতে অংশগ্রহণ করেন।

* * *

৬ই নভেম্বর সকাল ৯টায় প্রথমে আমরা বেইজিং এর প্রসিদ্ধ চৌরাস্তা (স্কোয়ার) 'থিয়ান আন মানে' যাই। এটি পিপলস স্কোয়ার

নামে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ ময়দান। ময়দানটি বেইজিং এর কেন্দ্রীয় সড়ক চাং ইন স্ট্রীটে অবস্থিত। এই সড়কটিও অতি প্রশস্ত। যতদূর মনে পড়ে, কোন শহরের অভ্যন্তরাংশে এত চওড়া সড়ক আমি দেখিনি। এই সড়কের গ্রেট হল সংলগ্ন চৌরাস্তাকে পিপলস স্কয়ার বলে। এখানে পৌঁছে চাং ইন স্ট্রীট থেকে পশ্চিম দিকে এর চেয়েও কয়েক গুণ বড় একটি পাকা ময়দান রয়েছে। যার পশ্চিম প্রান্তে সেই ভবন রয়েছে, যার মধ্যে মাও সে তুং এর দেহ সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। উত্তর দিকে গ্রেট হল ও দক্ষিণে একটি যাদুঘরের সুন্দর ইমারত অবস্থিত। এ সকল ভবনের মধ্যবর্তী একটি পাকা ময়দান খালি পড়ে আছে, যার মধ্যে তিনটি ব্যস্ততম সড়কও রয়েছে, এটিই 'থিয়ান আন মান' বা পিপলস স্কোয়ার। এটি একসাথে দশ লক্ষ মানুষ ধারণ করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমাবেশসমূহ এই ময়দানে হয়ে থাকে। উত্তর দিকে স্থাপত্য শিল্পের এক সুদৃশ্য পাথুরে ভবন নির্মিত হয়েছে। যা সমাবেশের ষ্টেজরূপে ব্যবহৃত হয়। এটি বিস্তৃতি, প্রশস্ততা, সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও লোক ধারণের ক্ষমতার দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে একক ও অতুলনীয়। এখানে সর্বদা শত শত পর্যটকের ভীড় থাকে। তবে কোনরূপ বিশৃংখলা হয় না। চাং ইন স্ট্রীট হয়ে অতিক্রমকালে এই ভীড়ও দেখার মত একটি জিনিস।

পদব্রজে এই ময়দান অতিক্রম করতে প্রচুর সময় লাগে। আমরা গাড়ীতে চড়ে এটি অতিক্রম করে দক্ষিণ প্রান্তে মাও সে তুং এর ভবনের সন্নিকটে অবতরণ করি। ভিতরে প্রবেশকারীদের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা একটি সারি এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। একটি হল কক্ষে মাও সে তুং এর মমি করা লাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শোকেসে রক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাই। দেহের বেশি অংশ চাদর দ্বারা আবৃত। তবে বক্ষ, পায়ের নলা ও মুখমণ্ডল উন্মুক্ত, যা শোকেসের ভিতর থেকে পরিস্কার দেখা যায়। মানুষ এই বিস্ময়কর লাশ দেখার জন্য এখানে এসে থাকে যে, কি করে এক ব্যক্তির লাশ ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত মমিরূপে অপরিবর্তিত আছে। এটি একটি আজব ব্যাপারই বটে। কিন্তু এই বিস্ময়কর বস্তু দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা

ব্যয়কারীদেরকে কে এই কথা বলবে যে, মাও সে তুং এই চর্ম ও অস্থির নাম নয়। মাও সে তুং যার নাম ছিল, না জানি সে কোথায় কি অবস্থায় আছে। মূল্যবান মসলা গোশত ও চামড়াকে সংরক্ষণ করতে পারে বটে, কিন্তু সেই আত্মা সংরক্ষণের জন্য আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান কোন মসলা আবিস্কার করতে পারেনি, যে আত্মা দেহত্যাগের পর সচল একজন মানুষ প্রাণহীন পাথরে পরিণত হয়।

শিক্ষার মূর্তপ্রতীক সংরক্ষিত এই দেহ এখন পর্যন্ত যদিও অনেক চীনা মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধার কেন্দ্র, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে মাও সে তুং এর সেই পরিমাণ শ্রদ্ধা এখন আর অবশিষ্ট নেই, যে পরিমাণ তার জীবদ্দশায় ছিল। প্রথমে সে এমন এক নিষ্পাপ পথপ্রদর্শক ছিল, যার চিন্তা ও কর্মের উপর কোনরূপ সমালোচনা করার কল্পনাও কঠিন ছিল। কিন্তু আজ তার নীতির ব্যাপারে জোরালো সমালোচনা করা হচ্ছে। কমিউনিষ্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসের তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (যা ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়) সরকারের নীতিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনা হয়। (এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আগামীতে আলোচনা করব)। সমাবেশে এ বিষয়টি অত্যন্ত উদারচিত্তে ও স্পষ্ট ভাষায় মেনে নেওয়া হয় যে, সভ্যতার বিপ্লবের দশ বছরে চীনকে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এবং এই ত্রুটিপূর্ণ নীতিমালার দায়দায়িত্ব বিশেষভাবে চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর উপরই যে বর্তায় তা বলাই বাহুল্য। একবার বেইজিং এর পত্রিকা পিপলস ডেইলী লেখে যে, মাও সে তুং এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার থেকে ভুলও ঘটেছে বিরাট। যাই হোক আমরা এ সম্পর্কে ভ্রমণ কাহিনীর শেষে পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ডং সি জামে মসজিদ

তারপর আমরা বেইজিং এর 'ডং সি' জামে মসজিদ দেখতে যাই। মসজিদটি ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে (সপ্তম হিজরী শতাব্দী) নির্মিত হয়। সামনের মেহরাব পাথরের তৈরী। অনেক প্রাচীন এর নির্মাণশৈলী। অবশিষ্ট সম্পূর্ণ মসজিদ দেবদারু জাতীয় এক বৃক্ষের কাঠ দ্বারা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, এর মধ্যে একটিও লোহার পেরেক ব্যবহার করা হয়নি। মুং

সম্প্রদায়ের চীন সম্রাটদের যুগে প্রচলিত নিখাদ চীনা ধাঁচে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। কাঠ অত্যন্ত মজবুত। তার উপর স্বর্ণের পানি দ্বারা অঙ্কিত চিত্রসমূহ অত্যন্ত সুদৃশ্য। প্রায় পাঁচশত বছর অতিক্রম করার পরও তার উজ্জ্বলতার কারণে মনে হয় যে, এইমাত্র মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে।

মসজিদ সংলগ্ন দুটি গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারদ্বয়ে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থের বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে। এর মধ্যে ৭১৮ হিজরীতে লিপিবদ্ধ পবিত্র কুরআনের খুব মনোরম একটি কপি রয়েছে। এর লেখকের নাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবদুর রহমান আছছারায়ি উল্লেখ আছে। প্রায় সাতশত বছর অতিক্রম করার পরও লেখনী এত পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল রয়েছে যে, বর্তমান যুগের মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের ছাপাও এমন পাওয়া দুস্কর।

এছাড়াও আরবী, ফারসী ও চীনা ভাষায় লিখিত প্রচুর ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে। যার মধ্যে তাফসীরে জালালাইন, আশ'আতুল্লাম'য়াত, শরহে আকায়েদ, মাকামাতে হারীরী, শরহে জামি, শরহে বেকায়া ও ফুসূসুল হিকাম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্লামা শামী প্রণীত রদ্দুল মুহতার ও আল বাহরুর রায়িকেরও কয়েকটি করে কপি দেখতে পাই। আমার মনে হচ্ছিল যে, বিপ্লবের পূর্বে এখানে বড় কোন মাদ্রাসা ছিল, সেই মাদ্রাসার গ্রন্থগুলো যুগের ঝাপটা থেকে রক্ষিত আছে। মসজিদ সংলগ্ন একটি দ্বীনী মাদ্রাসাও রয়েছে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউটের মতই তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকায়েদ ও ইসলামী ইতিহাসের পাঁচ বছর মেয়াদী পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠ দান করা হয়। আগামী বছর এখানে একটি নতুন শ্রেণী আরম্ভ করার প্রোগ্রাম আছে। মসজিদের ইমাম শায়েখ ছালেহ একজন বর্ষিয়ান বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি বেইজিং এর আঞ্চলিক ইসলামিক এসোসিয়েশনেরও সভাপতি। মসজিদে তিনিই আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন ঃ বেইজিং শহরে একলাখ আশি হাজার মুসলমান এবং ৪৬টি মসজিদ রয়েছে। এমন অনেক মসজিদ বর্তমানে খুলে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সভ্যতার বিপ্লবের যুগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং

সেগুলো মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মুসলমানগণ সেগুলোতে নিশ্চিন্তে এবাদত বন্দেগী করে থাকে। আমরা জানতে পারি যে, সেই বড় বড় ৪৬টি মসজিদ ছাড়াও ছোট ছোট আরো অনেক মসজিদ রয়েছে।

এ সময় বেইজিং এর বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার এক ছাত্র তাজবীদ সহকারে মধুর স্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে। অধমের এক প্রশ্নের উত্তরে ইমাম সাহেণ জানান যে, পাঁচ বছর মেয়াদী পাঠ্যক্রমের মাদ্রাসা ছাড়া বিভিন্ন মসজিদে মক্তবও প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তার সংখ্যাও বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বা যেসব প্রতিনিধি দল এখানে আসেন তাঁরা সাধারণতঃ এই মসজিদেই নামায পড়ে থাকেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক সাহেব তাঁর চীন ভ্রমণের সময় জুমুআর নামায এখানেই আদায় করেন। তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত মসজিদের উপঢৌকনসমূহ যেমন গালিচা ও বিভিন্ন ফলক ইত্যাদি এখানে বিশেষ এক স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে। ইমাম সাহেব আমাদেরকে বিশেষভাবে সেগুলো দেখান।

নিষিদ্ধ নগরী

বিকাল তিনটায় 'নিষিদ্ধ নগরী' ভ্রমণের প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। এটি বেইজিং শহরের ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মূলত এটি চীনের মুং সম্প্রদায়ের সম্রাটদের নির্মিত এক বিস্তৃত ও প্রশস্ত দূর্গ। যার মধ্যে রয়েছে বিরাট বিরাট শাহী মহল। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দূর্গ বলে প্রসিদ্ধ। এর বিস্তৃতির অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে, এই দূর্গের ছোট বড় সকল কক্ষের মোট সংখ্যা নয় শত নিরানব্ববইটি। মুং সম্রাটদের যুগে এখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বিধায় একে 'নিষিদ্ধ নগরী' বলা হয়। দূর্গের চতুর্দিকে বিরাট প্রাচীর রয়েছে। এর প্রধান ফটকের ভিতরে প্রবেশ করার পর, পর পর ষোলটি আলীশান মহল রয়েছে। প্রত্যেক মহলের মূল অংশে ভুমি থেকে প্রায় দুই তলা বরাবর উঁচুতে একটি সিংহাসন আছে। দেবদারু জাতীয় সনুবর বৃক্ষের

কাঠ দ্বারা একটি জাঁকজমকপূর্ণ সুদৃশ্য হল কক্ষ তৈরী করা হয়েছে। তার সম্মুখের সিঁড়ি ও পানির ফোয়ারা অতিক্রম করার পর প্রশস্ত আঙ্গিনা এবং ডানে বামে দীর্ঘ কক্ষ সারি রয়েছে।

একটি মহলে দাঁড়িয়ে কোনভাবেই অনুমিত হয় না যে, এর পিছনে আরো কোন মহল রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক মহলের প্রধান হলকক্ষের কোণা থেকে ছোট্ট একটি পথ বের হয়ে অপর মহলে পৌঁছে গেছে।

মুং সম্রাটগণ প্রতিটি মহলের প্রধান হলকক্ষেরই পৃথক পৃথক নাম রেখেছিলেন। প্রত্যেকটি হলকক্ষ ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য নির্ধারিত ছিল। যেমন প্রথম হলকক্ষটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সম্প্রীতি কক্ষ'। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করা হয়। এই হলকক্ষটি সাড়ে পঁয়ত্রিশ মিটার উঁচু এবং দুই হাজার তিনশত সাতাত্তর বর্গমিটার আয়তনের উপর অবস্থিত। এখানে মুং ও চুং সম্প্রদায়ের সম্রাটগণ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করতেন। সম্পূর্ণ মহলটি সনুবর বৃক্ষের কাঠে তৈরী এবং চীনা নির্মাণ পদ্ধতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

অপর একটি হলকক্ষের নামকরণ করা হয়েছে 'সংরক্ষণ প্রাসাদ'। এটিও ১৪২০ খৃষ্টাব্দেই নির্মাণ করা হয়। এটি ২৯ মিটার উঁচু ও ১২৪০ বর্গমিটার প্রশস্ত। এই হলকক্ষে রাজদূতদের সংবর্ধনা এবং শাহজাদাদের আপ্যায়ন করা হত। এখানে একটি রাজকীয় পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হত। যাকে সে যুগের উচ্চতর শিক্ষার উৎকর্ষ মনে করা হত। বর্তমানে এই হলকক্ষে একটি যাদুঘর রয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীন কালের অনেক পাত্র ইত্যাদি রাখা আছে। এখানে খৃষ্টপূর্ব আট শতাব্দীর একটি ডেগ ও চাকু রয়েছে। অতি সুদৃশ্য কারুকার্য করা একটি পেয়ালা সংরক্ষিত অছে, যার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আজও অক্ষত রয়েছে। পেয়ালাটি খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর। হিংস্র প্রাণীর অস্থি দ্বারা তৈরী খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর কিছু সৌখিন সামগ্রীও এখানে রয়েছে।

ভবনগুলোর মেঝেতে লোহা নির্মিত আগরদানী সংরক্ষিত আছে। যা উৎকৃষ্টতম শিল্পকর্মের নিদর্শন। জায়গায় জায়গায় পিতলের তৈরী বড় বড় জলপাত্র রয়েছে। যা আগুন নিভানোর কাজে ব্যবহৃত হত। কোন কোন স্থানে বিস্ময়কর ও বিরল পাথরকাটার নিদর্শন দেখা যাচ্ছিল।

এভাবে ষোলটি মহল অতিক্রম করার পর মনোরম একটি উদ্যান রয়েছে। এতে বিচিত্র ধরনের বৃক্ষ রয়েছে। দুটি করে বৃক্ষ চার পাঁচ ফুট দূরত্বে লাগিয়েছে। কিন্তু এর রোপনকারী (মালী) উভয় বৃক্ষকে পরস্পর এভাবে সংযুক্ত করেছে যে, উভয় গাছের মূল পৃথক, কিন্তু এক মানুষ পরিমাণ উপরে গিয়ে গাছের ডাল পরস্পরে একাত্ম হয়ে এক দেহ এক প্রাণের রূপ লাভ করেছে। উভয়ের পরস্পর মিলনের কারণে সুদৃশ্য মেহরাবের আকৃতি ধারণ করেছে। আরেকটি হলকক্ষ সম্রাটদের কার্যালয়রূপে ব্যবহৃত হত। এতে সম্রাটের আসন এবংতার সম্মুখের যাবতীয় বস্তু এমনভাবে সাজানো রয়েছে, যেন তিনি আজই এখান থেকে উঠে গিয়েছেন।

আমি বিভিন্ন দেশে বহু দূর্গই দেখেছি, কিন্তু এ দূর্গটি বিস্তৃতির দিক দিয়ে অতুলনীয় এবং এর অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যাবলী বর্তমানেও আগের মতই অক্ষত রয়েছে, যা দেখে এ প্রবাদটির বিশুদ্ধতার অনুমান হয়।

نزلة الحكمة على ايدى الصين

অর্থ ঃ শিল্পকর্ম চীনাদের হাতে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ দিনই রাতে পাকিস্তানের দূত জনাব আনোয়ার ভাট্টি সাহেব প্রতিনিধিদলের সম্মানে এক নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। সেখানে ইসলামিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বোরহান শহীদী সাহেব, চীনের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন উপরোস্থ অফিসারও আমন্ত্রিত ছিলেন। আনোয়ার সাহেবের বাড়ীতেই নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়। এই বাড়ীটিও দূতাবাসের ন্যায় পাকিস্তানের প্রকৌশল বিশেষজ্ঞদের নকশা অনুপাতে অতি সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তানী নির্মাণ পদ্ধতির ঝলক রয়েছে। নৈশভোজের সময় মজার মজার কথাবার্তা চলে। রাত এগারোটায় আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

চীনের প্রাচীর

৬ই নভেম্বর ভোরে মেজবানগণ জগত বিখ্যাত চীনের প্রাচীর ভ্রমণের প্রোগ্রাম রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর এই প্রাচীর দেখার

আগ্রহ আমাদেরও ছিল। ভোর আটটায় আমরা আমাদের অবস্থানস্থল থেকে তিনটি প্রাইভেট কারযোগে রওয়ানা হই। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ ছাড়াও চায়না ইসলামিক এসোসিয়েশনের সহসাধারণ সম্পাদক শেখ সুলায়মান ও সংগঠনের আরও কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের সফরসঙ্গী হন। বেইজিং ইউনিভার্সিটির উর্দূ ভাষার প্রভাষক মিঃ খু'বান—একজন চীনা অমুসলিম ব্যক্তি হলেও তিনি খুব সাবলিলভাবে উর্দূ বলতে পারেন। উর্দূর প্রবাদ, পরিভাষা ও সাহিত্য ধারা সম্পর্কে তিনি অবাক করার মত জ্ঞান রাখেন। এ সম্পূর্ণ সফরে তিনি দোভাষী ও পথপ্রদর্শকরূপেন সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকেন। সফরের কোন ক্ষেত্রে আমাদের আরামের ব্যবস্থা করতে এবং যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করতে তিনি কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। তিনি সব জায়গার মত এখানেও আমাদের সঙ্গী ছিলেন এবং খুব সুন্দরভাবে দোভাষীর ও পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

চীনের প্রাচীরের যে অংশ পর্যটনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে 'দূররায়ে নাংকু' বলা হয়। যা এখান থেকে ৫০/৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বেইজিং এর আবাসিক এলাকা থেকে বের হওয়ার পর পথটি বেশির ভাগ ছোট ছোট পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

চীনের প্রাচীরকে চীনা ভাষায় 'চাং চ্যান' (Chang Chena) বলা হয়। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ও দীর্ঘতম নগর প্রাচীর। খৃষ্টপূর্ব যুগে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। তখন চীনে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। বিভিন্ন রাজা ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্রোহের ধারা অনবরত লেগেই থাকত। তাই রাজ্যের পরিচালকগণ নিজ নিজ ভূখণ্ডকে শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন। এ প্রাচীর কোন এক নগরীর পার্শ্বে নয় বরং পুরা রাজ্যের চতুর্দিকে অথবা যেদিক থেকে শত্রুর আক্রমনের অধিক আশংকা হত সেদিকে নির্মাণ করা হত। এভাবে চীনের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলো প্রাচীর নির্মিত হয়।

খৃষ্টপূর্ব ২৪৬ সালে চিং শিহুয়াংতি এসব রাজ্যকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে পুরা দেশকে এক করে ফেলেন। তাই খৃষ্টপূর্ব ২২৮ সালে তিনি এসব

বিচ্ছিন্ন প্রাচীরকে পরস্পর মিলিয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ কাজ শেষ করতে কয়েক বছর সময় লেগে যায়। পরিশেষে এটি এক হাজার পঁচিশ মাইল দীর্ঘ একটি প্রাচীরের রূপ লাভ করে।[১]

যা 'সাংহাই' থেকে 'পিয়াও' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন তার অনেকাংশ ভেঙ্গে গেছে। অনেক জায়গায় ভগ্ন প্রাচীরের দৃশ্য রয়েছে আবার কোথাও বা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু চীনের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও এটাকে ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় দেখা যায়। পরবর্তীতে চীনের মুং সম্প্রদায় (আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে) এটি মেরামত করে। অনেক জায়গায় পুনঃনির্মাণ করে।

'নানকো' প্রাচীরে (যেখানে সাধারণতঃ মানুষ পর্যটনের উদ্দেশ্যে যায়) পৌঁছার কয়েক মাইল পূর্বেই পাহাড়ের উতরায় ও চড়াইতে নির্মিত প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়। তবে পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় স্থান হিসেবে নানকো প্রাচীরের সেই উপত্যকাই নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সবদিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা এবং যেখানে প্রাচীরের পথে পর পর পাঁচ ছয়টি পাহাড় আসে। এ প্রাচীর প্রত্যেক পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে, আবার সেখান থেকে নীচে নেমে এসেছে এবং সর্বদিক থেকে এটি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়।

প্রাচীরটি তের ফুট প্রশস্ত। ভূমি থেকে এর উচ্চতা গড়ে বিশ ফুট। প্রাচীরটি তার উচ্চতা ঠিক রেখে উঠানামা করেছে। দূর্গের প্রাচীরের ন্যায় এরও স্থানে স্থানে চূড়া ও গোপন কুঠুরী বানানো আছে, যা সে যুগে প্রতিরক্ষা চৌকি ও সংবাদ প্রেরণের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা হত। এই প্রাচীরের আসল উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দুর্ধর্ষ মঙ্গলিয়া ও অন্যান্য জাতির আক্রমন প্রতিহত করা। যদি কোন চূড়ার সংরক্ষকগণ তাদের দিক থেকে শত্রুর আক্রমনের আশংকা করত, তাহলে তারা সেখানে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করত। অন্য চূড়ার লোকেরা এই ধোঁয়া দেখতে পেয়ে তারাও তাদের সেখানে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি

টীকা ঃ ১. আমাদের পথপ্রদর্শক চীনের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৬ হাজার কিঃ মিঃ বলছিলেন, কিন্তু তার এ বক্তব্য অতিরঞ্জিত। সাধারণত বিভিন্ন গ্রন্থে এর দৈর্ঘ্য ১৪শ বা ১৫শ মাইল বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার কিঃমিঃ। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬২ ও ৫৪২ দ্রষ্টব্য)

করে তাদের পরবর্তী চৌকিকে সতর্ক করে দিত। রাতেরবেলায় আগুন দ্বারা এ কাজ নেয়া হত।

আমরা প্রাচীরের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে সম্মুখের তিনটি পাহাড়ের উচ্চতা অতিক্রম করি। তখন এখানে প্রচণ্ড শীত এবং প্রবল বাতাস চলছিল। আল্লাহর শোকর, আকাশ পরিস্কার থাকায় তা সহ্যসীমার মধ্যে ছিল। শীতকালে এখানে রক্ত জমে যাওয়ার উপক্রম হয় বলে শুনেছি। এই প্রাচীর থেকে উপত্যকাই শুধু নয়, বরং আঁকাবাঁকা প্রাচীরের অন্যান্য অংশের দৃশ্যও খুব সুন্দর দেখা যায়। তৃতীয় পাহাড়ের উপর পৌঁছতে পৌঁছতে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাই আমরা ফিরে আসি। প্রত্যাবর্তনকালে এ জায়গাটিকে আরো বিপদজনক এজন্য মনে হয় যে, পৃথিবীর প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তির কারণে ঢালু স্থানে কোন কোন সময় মাথা চক্কর দিতে থাকে এবং যে সমস্ত লোক প্রাচীরের প্রান্তে লাগানো লোহা না ধরে ঢালুর দিকে নামে, তারা কোন কোন সময় ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে পড়েও যায়।

প্রাচীরের প্রশস্ততা ও উচ্চতা এমন অসাধারণ কিছু নয়। দূর্গের প্রাচীরসমূহ এর চেয়েও অধিক উঁচু ও চওড়া হয়ে থাকে। তবে দেড় হাজার মাইল লম্বা হওয়ার কারণে এটি বিশ্বের বিস্ময়কর বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া এ অঞ্চলটি যদি সমতল ও মাঠের মতো হত, তাহলে হয়ত এত আশ্চর্যের বিষয় হত না। চীনের অধিকাংশ অঞ্চলের ন্যায় এ সকল অঞ্চলও পাহাড়ে ভরা, যে কারণে এটি অধিক বিস্ময়কর বলে গণ্য হয়েছে।

মোটকথা, পৃথিবীর এই বিখ্যাত বস্তুর দর্শনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়েছে।

মুং সম্প্রদায়ের কবরস্থান

চীনের প্রাচীর দেখে ফেরার পথে মেজবানগণ আমাদেরকে বেইজিং এর অপর একটি ঐতিহাসিক স্থান মুংদের কবরস্থানে নিয়ে যান। এটি চীনের মুং সম্প্রদায়ের বারোজন সম্রাটের সেই সমাধিস্থল, যা প্রত্যেক সম্রাট নিজের জন্য তাদের জীবদ্দশাতেই নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পরেও বাদশাহ থাকবেন বলে সে যুগের সম্রাটদের মাথায় অদ্ভূত এক চিন্তা চেপে বসে। ধনদৌলত, খাদেম–নফরও তাদের সঙ্গে কবরে যাবে বলে তারা বিশ্বাস করতেন। এই অদ্ভূত চিন্তার ফলেই কোন কোন রাজবংশে তাদের সঙ্গে তাদের প্রিয় দাস–দাসীকেও কফিনে করে সমাহিত করার প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে এ মানবতা বিধ্বংসী পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বাদশাহের সঙ্গে স্বর্ণ, হীরা, মানিক্য, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্য ও পানির বিরাট স্তূপ ও অন্যান্য জিনিস কবরের মধ্যে রেখে দেওয়ার প্রচলন চালু থাকে। একটি কফিন বাদশাহর থাকলে, অনেকগুলো কফিন থাকত এসব জিনিসের। এতদ্ব্যতীত কবরে উন্নতমানের ফার্নিচার ও আসবাবপত্রও রেখে দেওয়া হত। যেন বাদশাহর রাজত্ব এখন মাটির নীচে স্থানান্তরিত হল।

কিন্তু তারা অতি মূল্যবান এসব সামগ্রী কবর থেকে চুরি যাওয়ার ও অন্যান্য বংশের শত্রুতার ভিত্তিতে বাদশাহর শবদেহ উঠিয়ে নেওয়ার আশংকা করে। তাই প্রত্যেক সম্রাট তার জীবদ্দশায় নিজের সমাধির উপরিভাগে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট আকারের একটি ভবন নির্মাণ করাত। সেই ভবনের মাটির নীচে সমাধির মধ্যে বাদশাহর কফিন রাখা হত। এই সমাধির পথ সম্রাট ও তার কিছু অন্তরঙ্গ লোক ছাড়া অন্য কারো জানা থাকত না। বাদশাহর মৃত্যুর পর তার কফিনের সঙ্গে স্বর্ণ, হীরা, মানিক্য ইত্যাদির কফিনসমূহ সেই গোপন পথে ভূগর্ভস্থ সমাধিতে পৌঁছে দেওয়া হত। পরবর্তীতে যেসব লোক বাদশাহর কবরে যেতে চাইত, তারা ভূপৃষ্ঠের ভবনের সামনে ভক্তি পেশ করে চলে আসত। আসল কফিন পর্যন্ত কারো যাওয়া হত না।

এ অঞ্চলে এই জাতীয় বারজন সম্রাটের সমাধি রয়েছে। যাদের প্রতীকি ভবনসমূহ ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তাদের ভূগর্ভের সমাধিসমূহের পথ আজও কেউ জানতে পারেনি। শুধুমাত্র সম্রাট চু–ইয়ং (ওয়াংলি যার উপাধি) এর সমাধির সন্ধান আটাশ বছর পূর্বে জানা গেছে।

এই সমাধি সম্পর্কে এভাবে অবগত হওয়া যায় যে, ওয়াং লির সমাধির উপরোস্থ ভবনের অনেক দূরে কিছু ক্ষেত রয়েছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে

একজন কৃষক হাল চাষ করার সময় মাটির মধ্যে ফলকের ন্যায় একটি পাথরের নিদর্শন দেখতে পায়। সেই ফলকে ভূগর্ভের সমাধি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বিশেষ একদিকে মাটি খনন করার দিক নির্দেশনা ছিল। সেখান পর্যন্ত মাটি খনন করার পর আরেকটি ফলক পাওয়া যায়। যার মধ্যে পরবর্তী দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এই দিকনির্দেশনা অনুপাতে খনন কার্য চালাতে চালাতে সমাধির দরজা বের হয়ে আসে। এ দরজা খোলার পদ্ধতি ছিল গোপন ধরনের। যা হোক দরজা খোলার পর ভিতরে বিরাট এক হল কক্ষ দেখা যায়। যার মধ্যে সম্রাটের কফিন রক্ষিত ছিল।

আমরা ওয়াং লির সমাধির উপরোস্থ ভবন থেকে অনেক দূর যাওয়ার পর সেই জমিতে পৌঁছি। সেখানে নীচে অবতরণের জন্য সিঁড়ি বানানো আছে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করি। ১৪ ধাপ বিশিষ্ট ১ ডজনের মত সিঁড়ি অতিক্রম করার পর ভিতরের কবরের দরজা দৃষ্টিগোচর হয়। দরজার উভয় পাল্লা কয়েক টন ওজনের পাথরের তৈরী। পাল্লাটি একটি পাথরের বলে মনে হচ্ছিল। অনেক মানুষ সম্মিলিতভাবেও দরজার পাল্লা নাড়াতে পারবে না। তবে এতে বিস্ময়কর কিছু পেরেক লাগানো রয়েছে, দরজা খোলার জন্য সেগুলো ব্যবহার করা হত। দরজায় প্রবেশ করে বিরাট বড় এক হলকক্ষ দেখতে পাই। হলকক্ষটি ৮৭.৩৪ মিটার লম্বা। তার মোট আয়তন ১১৯৫ বর্গমিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। এক অংশে বাদশাহর দৈত্যাকারের বিরাট কফিন এবং এর আশেপাশে তুলনামূলক ছোট অনেকগুলো কফিন রাখা আছে। যেগুলোর মধ্যে স্বর্ণ ও হীরা–জহরত ইত্যাদি ভরা হয়েছিল। অপর অংশে পাথর নির্মিত চেয়ার, খাট, বড় বড় জলপাত্র ইত্যাদি রাখা আছে। তৃতীয় অংশ খালি। এখানে একটি সাইন বোর্ড বসানো আছে। এতে লিখিত আছে যে, এই হলকক্ষের নির্মাণের সূচনা হয়েছে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে। ছয় বছরে এ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর নির্মাণ কাজে ৪ লাখ কেজি রূপা ব্যয় হয়েছে।

হলকক্ষের এ অংশের শেষ প্রান্তে বাইরে বের হওয়ার জন্য সিঁড়ি বানানো আছে। যা সমাধির উপরোস্থ ভবনে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানকার সিঁড়ির ধাপ প্রবেশ পথের সিঁড়ির ধাপের তুলনায় অনেক কম, এতে ১১৫টি ধাপ রয়েছে।

এতে সন্দেহ নাই যে, নির্মাণশিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে এই মুং–সমাধি একটি ঐতিহাসিক রাজকীয় কর্মের গুরুত্ব রাখে। কিন্তু আমরা দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হলে বুঝতে পারতাম যে, মূলত এটি এমন এক বিস্ময়কর ও বিরল শিক্ষাগার যে, এ সব লোক নির্মাণ শিল্পে ও পাথর কাটার কাজে বিস্ময়কর মেধা, নৈপুণ্য, বিচক্ষণতা ও শৈল্পিকতার প্রমাণ দিতে পেরেছে। কিন্তু তারা সামান্য সম্মুখের এই বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল যে, মৃত্যুর পর স্বর্ণ ও হীরা–জহরতের এ সকল স্তূপ মৃত ব্যক্তির জন্য মাটির ঢেলা থেকেও মূল্যহীন। যে সকল লোক আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জন্য চীনের প্রাচীর ও নিষিদ্ধ নগরী নির্মাণ করতে পেরেছে, তারা মৃত্যুর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য কোন প্রাচীর দাঁড় করাতে পারেনি। তাদের বিশাল প্রাচীরসমূহও মালাকুল মওত আজরাঈলের পথ রোধ করতে সক্ষম হয়নি। শেষ পরিণতি তাই হয়েছে, যা হয়ে থাকে একজন সহায় সম্বলহীন মজদুর এবং একজন নিরূপায় কৃষকের। এই বাস্তবতা কল্পনা করতে গিয়ে স্বরচিত এই কবিতা স্মরণ হয় ঃ

جو مرکزِ اُلفت تھے، جو گلزارِ نظر تھے — سڑتے ہیں تہِ خاک وہ اجسامِ بتاں آج
وہ دبدبہ جن کا تھا کبھی دشت و جبل میں — وہ تاجِ سکندر ہے، نہ وہ تختِ کیاں آج
وہ جن کے تہوّر سے دہلتی تھیں زمینیں — ڈھونڈے سے بھی اُن کا کہیں ملتا ہے نشاں آج
تھی جن کی جھلا جھل سے چکا چوند نگاہیں — عبرت کے کھنڈر ہیں وہ محلاتِ شہاں آج
جن باغوں کی نکہت سے معنبر تھیں فضائیں — ہے مرثیہ خواں اُن پہ بوموں کی زباں آج

যেসব রূপসী ভালবাসার কেন্দ্র ছিল, নয়নের কানন ছিল,
তাদের কোমল দেহ আজ মৃত্তিকার তলে পঁচছে।
সেসব সম্রাট, পাহাড়ে প্রান্তরে যাদের শান শওকত কার্যকর ছিল,
সেই সিকান্দারের মুকুট, সেই কিয়ার রাজ সিংহাসন আজ আর নেই।
সেসব লোক, যাদের অসন্তুষ্টিতে পৃথিবী প্রকম্পিত হত,
বহু সন্ধান করেও তাদের কোন নিদর্শন আজ আর পাওয়া যায় না।

সম্রাটদের সে সব প্রাসাদ, যেগুলোর রূপলাবণ্যে দৃষ্টি ঝলসে উঠত,
আজ তা শিক্ষণীয় ধ্বংসাবশেষ।
যেসব কাননের ঘ্রাণে পরিবেশ ছিল মোহিত,
আজ সেখানে বুলবুলি শোকগাঁথা গাইছে।

গ্রেট হলে নিমন্ত্রণ

ঐ দিন বিকাল ৫টায় চীনের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ ইবরাহীম ইয়ান চিং জিন এর সঙ্গে গ্রেট হলে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম ছিল। তিনি একজন মুসলমান এবং কাংসু প্রদেশের লোক। চীন সরকারের নিকট তিনি অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের একজন ব্যক্তি। সংখ্যালঘু বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া ছাড়াও তিনি চীনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান।

ঠিক ৫টায় আমরা গ্রেট হলে গিয়ে পৌঁছি। এটি আধুনিক চীনের স্থাপত্যসমূহের মধ্যে বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ইমারত। পিপলস স্কোয়ার (থিয়ান আন মান) এর নিকটে এটি অবস্থিত। এই ভবনটি চীনের পার্লামেন্ট হাউজও বটে। এতে মন্ত্রীদের চেম্বার এবং প্রত্যেক প্রদেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের জন্য পৃথক পৃথক হলকক্ষ রয়েছে। সেখানে তারা পরস্পর পরামর্শ করতে পারেন। এখানকার প্রধান হলকক্ষটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ হলকক্ষ বলে প্রসিদ্ধ। এর অভ্যন্তরে কোন স্তম্ভ নেই। হলকক্ষটি এত বড় যে, এতে রীতিমত ফুটবল খেলা যেতে পারে।

এই ভবনেরই এক অংশে মিঃ ইবরাহীম ইয়াং চিং জিন প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। এখানে পাকিস্তানী দূতাবাসের মন্ত্রীও সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। মিঃ ইবরাহীম ইয়ান চিং জিন পাকিস্তান সরকার চীনের হাজীদের পবিত্র হজ্জে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছে বলে বিশেষভাবে পাকিস্তানের শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। এ বৎসর চীনের দুই হাজার হাজী পবিত্র হজ্জ পালন করেন এবং হজ্জের সময় পাকিস্তান সরকার ও সেখানকার জনসাধারণ চীনের মুসলমানদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের উৎকৃষ্টতম মেজবানী করেন। তাদের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তার পর অধম চীনের মুসলমানদের সঙ্গে অধিক সহযোগিতার জন্য তিনটি প্রস্তাব

পেশ করি।

১. চীনের মুসলমানগণ যেন কিছু তরুণ যুবককে তৈরী করে ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য পাকিস্তান পাঠালে, আমরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার মানসম্পন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের পরিপূর্ণ শিক্ষা, অবস্থান, আহার–বিহার ও অন্যান্য সকল প্রয়োজনাদি পুরা করার ব্যবস্থা করতে পারি। এভাবে চীনের মুসলমানদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলেম তৈরী হওয়ার পথ সুগম হবে, যাঁরা নিজ নিজ এলাকায় ধর্মীয় পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন।

২. ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য বেইজিং, কাং সু ইত্যাদি জায়গায় ৫ বছর মেয়াদী পাঠ্যক্রমের যেসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাতে শিক্ষাদানের জন্য পাকিস্তান থেকে খণ্ডকালীন শিক্ষকের (Visiting Lecturers) ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৩. চীনে ইসলামী জ্ঞানশীর্ষক যেসব গ্রন্থের প্রয়োজন আমরা পাকিস্তান থেকে চীনের মুসলমান ভাইদের জন্য তা পাঠানোর ব্যবস্থাও করতে পারি।

মিঃ ইবরাহীম ইয়ান চিং জিন এসব প্রস্তাবকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাগত জানান এবং বলেন যে, এসব বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ আপনাদের দূতাবাসের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

মাগরিব পর মিঃ ইবরাহীম ইয়ান চিং জিন গ্রেট হলেরই একটি অংশে প্রতিনিধি দলের সম্মানে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁকে অপর একটি সরকারী সাক্ষাতে যেতে হয়। তাই তিনি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারলকে (যাকে চীনের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী বলাও বাঞ্ছনীয়) স্বীয় প্রতিনিধিরূপে রেখে চলে যান। নৈশ ভোজ চলাকালীন সময় উপরোক্ত বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ সম্পর্কে কথা হতে থাকে।

সুপ্রীম কোর্টের ভাইস প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে মধ্যাহ্ন ভোজ

৭ই নভেম্বর দুপুর ১২টায় চীনের সুপ্রীম কোর্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ রিন জিয়াং সান প্রতিনিধি দলের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। পাকিস্তানের মত চীনের সুপ্রীম কোর্ট (যাকে সুপ্রীম পিপলস কোর্ট বলে) দেশের উচ্চতর আদালত। মিঃ রিন জিয়াং সান এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। যার মর্যাদা একজন সহকারী চীফ জাষ্টিসের সমতুল্য। তিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রেসিডেন্টের পর আদালতের সবচেয়ে বড় সিনিয়র জজ।

মিঃ রিন জিয়াং সান বেইজিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রেস্তোরাঁয় এই ভোজের আয়োজন করেছিলেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা ভাষণে বলেন যে, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন শাখায় সহযোগিতা ও প্রতিনিধি দল বিনিময়ের ধারা চালু রয়েছে, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে আদালত পর্যায়ের পরস্পর সাক্ষাত এবং প্রতিনিধি দল বিনিময় খুব কমই হয়েছে। আমরা এবার খুব আনন্দিত যে, আলেমগণের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করছেন পাকিস্তান আদালতের একজন সদস্য। তাই আমরা এই সুযোগকে গনিমত মনে করে সাক্ষাতের এই আয়োজন করেছি। যাতে করে উভয় দেশের বিচার বিভাগের মাঝে সম্পর্কের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়।

অধমের পক্ষ থেকে উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর তার সঙ্গে চীনের বিচার ব্যবস্থার ব্যাপারে মনোমুগ্ধকর আলোচনা হতে থাকে। চীনের বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত যেসব উল্লেখযোগ্য বিষয় তার থেকে জানতে পারি, তার সারাংশ এই—

১. চীনের বিচার বিভাগের চারটি স্তর রয়েছে—

ক. মৌলিক সাধারণ আদালত (যা আমাদের দেশের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের ন্যায়, কিন্তু সরাসরি বিচার বিভাগের অধীন। প্রশাসনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই)। এসব আদালত কাওনটি তথা জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত।

খ. প্রেফিকচার (ডিভিশন)সমূহের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে

নগরভিত্তিক ইন্টারমিডিয়েট আওয়ামী আদালতসমূহ (যা আমাদের বিচার বিভাগের সিভিল এবং সেশন আদালতের অনুরূপ)।

গ. প্রাদেশিক উচ্চ আদালতসমূহ।

ঘ. সুপ্রীম পিপলস কোর্ট।

এছাড়া বিশেষ কিছু আদালত বিশেষ ধরনের মোকদ্দমা সমাধানের জন্যও প্রতিষ্ঠিত আছে।

২. প্রধান বিচারালয় (সুপ্রীম পিপলস কোর্ট) সকল আঞ্চলিক ও বিশেষ আদালতের তত্ত্বাবধান করে থাকে এবং প্রকৃত (Original) ও এপিলিয়েট (Applellate) শুনানীর অধিকারও আইন অনুপাতে ব্যবহার করে।

৩. চীনা আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমাসমূহে নিয়মতান্ত্রিক কার্য পরিচালনার পূর্বে আপোষভিত্তিক কর্মতৎপরতার উপর জোর দিয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সারাদেশে ৯ লক্ষ ৩৯ হাজারের অধিক নাগরিক আপোষ কমিটি প্রতিষ্ঠিত আছে। যার মধ্যে পয়ঁতাল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার লোক তৃতীয় পক্ষ রূপে দায়িত্ব পালন করে। এসব লোক কারখানা, খনি, গ্রাম ও বিভিন্ন মহল্লাতে নির্ধারিত আছে। বিবাদ আদালত পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই পরস্পরের আলোচনার মাধ্যমে মিমাংসা করে দেওয়ার জন্য তারা সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালান।

এছাড়া আদালতও প্রথম পদক্ষেপে উভয় পক্ষের মাঝে আপোষ করানোর জন্য চেষ্টা চালায়। এ উদ্দেশ্যে অনেক সময় জজের আদালত কক্ষের বাইরে গিয়ে উভয় পক্ষের সাথে কথাবার্তা বলতে হয় এবং কোন কোন সময় জজ নিজে বাদী বিবাদীর অবস্থান কেন্দ্রে গিয়ে জনসাধারণের সহযোগিতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করানোর চেষ্টা চালান। যার ফলে অনেক সময় আপোষের মাধ্যমে বিবাদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যদি আপোষমূলক পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়, তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে মোকদ্দমার আইনী ধারা পরিচালনা করে সমাধান দেওয়া হয়।

৪. আদালতী তৎপরতার কর্মপন্থা দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনার (Adversary System) পরিবর্তে, সন্ধানমূলক ব্যবস্থাপনার (Enquisitorial System) নিকটবর্তী হওয়ায় জজ শুধুমাত্র উভয় পক্ষের বক্তব্য

ও দলীল প্রমাণ শ্রবণ করেই ক্ষান্ত হন না, বরং মামলার বাস্তব ঘটনা যাচাই করে থাকেন। তাই সাক্ষীদের নিকট ঘটনার বিষয়ে নিজেও অনেক প্রশ্ন করে থাকেন। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাক্ষী (Additional Evidence) তলব করে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করেন এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রয়োজন হলে ঘটনাস্থলে গিয়ে তা পর্যবেক্ষণও করেন।

৫. অধম এখানে উচ্চতর রিটের শ্রবণাধিকার (Writ Jurisdiction) আছে কিনা তা জানতে চাইলে প্রথমে তারা রিট পরিভাষা সম্পর্কে অনবগতির কথা প্রকাশ করে। পরে অধম এর বিশ্লেষণ করে শোনালে তারা আংশিকভাবে এরূপ শ্রবণাধিকারের কথা স্বীকার করে। কিন্তু তাদের উত্তর শুনে আমার এই প্রতিক্রিয়া হয় যে, রিটের যে অর্থ ও কর্মপন্থা আমাদের দেশে চালু আছে, সেখানে এ সম্পর্কে এত বিস্তারিত ধারণা নেই।

৬. দেশে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দেওয়ানী মোকদ্দমার তুলনায় অধিক এবং ফৌজদারী মোকদ্দমাতেও চুরি সংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক।

মিঃ জিয়াং সান একজন ব্যক্তিত্বশালী হাসিখুশী মানুষ। তিনি অন্যান্য জজের সাহায্যে আমাদের প্রশ্নসমূহের নিশ্চিন্তে ও নির্দ্বিধায় এবং খোলা প্রাণে উত্তর দিতে থাকেন। আইনী পরিভাষা সংক্রান্ত কথাবার্তা চলার কারণে আমাদের চীনা দোভাষী মিঃ খুবান দরখাস্ত করেন যে, যদি আপনি তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন, তাহলে বেশি ভাল হয়। এতে অনুবাদের সমস্যা সৃষ্টি হবে না। বিধায় তার সঙ্গে অধিকাংশ কথাবার্তা ইংরেজীতে চলতে থাকে। মিঃ জিয়াং সান কিছু সময় ইংরেজীতে উত্তর দিতে থাকেন। কিন্তু পরে তিনি আদালতের এক দোভাষীর সাহায্য নেন। যিনি অধিক চালু ইংরেজী বলতে সক্ষম। তাই পরবর্তী কথাবার্তা তার মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হয়।

এখান থেকে আমাদেরকে কাংসু প্রদেশ ভ্রমণের জন্য বেলা দেড়টায় এয়ারপোর্ট রওয়ানা হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই মেজবানগণও প্রত্যেক কাজে সময়ের সংক্ষিপ্ততার ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন এবং ঠিক দেড়টার সময় উষ্ণভাবে আমাদের বিদায় জানান।

কাংসু প্রদেশ সফর

চীনে সর্বাধিক মুসলমান সিং কিয়াং প্রদেশে বাস করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আমাদের ছিল। কিন্তু চীনে অবস্থানের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হওয়া সহ আরো দুটি কারণে আমাদের মেজবান সংগঠন সিং কিয়াং এর পরিবর্তে কাংসু প্রদেশ ও সাংহাই প্রদেশ সফরের প্রোগ্রাম করেন। প্রথমতঃ, বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে যেসব প্রতিনিধিদল চীনে আসে তারা বারবার সিং কিয়াং ভ্রমণ করেছে। কিন্তু কাংসু ও সাংহাই–এ এখনও পর্যন্ত কোন প্রতিনিধিদল যায়নি। অথচ এই দুই প্রদেশেও বিরাট সংখ্যক মুসলিম বসতি রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সিং কিয়াং–এ প্রচণ্ড শীত শুরু হয়েছিল এবং বরফপাত হেতু সেখানে বিমান যাওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ ছিল। ইতিপূর্বে একবার এক পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল ঋতু খারাপ হওয়ার কারণে সিং কিয়াং–এ আটকা পড়ে যায়।

আমরা ৭ই নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের নিমন্ত্রণ সেরে যখন বের হই, আকাশে তখন মেঘ ছিল। হালকা হালকা বৃষ্টি ও প্রচণ্ড বাতাসের কারণে তাপমাত্রা হিমাংকের নিকট পৌঁছেছিল। যখন বিমানবন্দরে পৌঁছি তখন আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে সমস্ত বিমান বন্ধ ছিল। তাই প্রায় দুই ঘন্টা সময় আমাদেরকে ভি.আই.পি লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে হয়। এই সফরে পাকিস্তানী দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী মিঃ হাসান জাবিদও প্রতিনিধিদলে শামিল হন। তিনি একজন চৌকস ও সচেতন যুবক। তিনি চীনা ভাষা খুব দ্রুত বলতে পারেন। তাছাড়া চায়না মুসলিম এসোসিয়েশনের ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সুলায়মানও মেজবানরূপে আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

প্রায় সাড়ে চারটার সময় আমরা চায়না এয়ারলাইন্সের ট্রাইডেন্ট বিমানে আরোহণ করি। প্রায় পৌনে দু' ঘন্টা উড্ডয়নের পর বিমান কাংসুর রাজধানী লান–চুতে পৌঁছে। অবতরণের পূর্বে পাইলট ঘোষণা করেন যে, এখানকার ভূমিতে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে চার সেন্টিগ্রেট নীচে বিরাজ করছে। আমরা যখন বিমান থেকে অবতরণ করি তখন প্রচণ্ড তুষার বায়ুর বেগ চলছিল, কিন্তু এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনাকারীদের ভীড়ের

উষ্ণতা প্রচণ্ড শীত মওসুমকে বিস্মৃত করে দেয়। ভি.আই.পি লাউঞ্জে মাগরিবের নামায আদায় করে আমরা শহরের দিকে রওয়ানা করি। শহর বিমান বন্দর থেকে ৬০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। তাই শহরে পৌঁছতে এক ঘন্টারও অধিক সময় লেগে যায়।

'লাং চু', কাংসু প্রদেশের রাজধানী এবং চীনের বিখ্যাত শিল্পনগরী, এ শহরটি জগৎখ্যাত হলুদ নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। হলুদ নদী চীনের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। তার দৈর্ঘ্য ৫ হাজার ৪ শত ৬৩ কিঃমিঃ। তার উৎস হতে যে সকল শাখা–প্রশাখা জন্ম নিয়েছে তার সর্বমোট আয়তন ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪শত ৪৩ বর্গ কিঃমিঃ। নদীটি চিং হাই প্রদেশের পায়ানহার পর্বতের উত্তর দিক থেকে নেমে এসেছে এবং বিভিন্ন প্রদেশ অতিক্রম করে সাং তুং অঞ্চলের উহানি উপসাগরে পতিত হয়েছে। হলুদ নদীর প্রান্তর একসময় চীনের সভ্যতা সংস্কৃতির লালনকেন্দ্র ছিল। এজন্য তাকে চীনা সভ্যতা ও সাংস্কৃতির দোল্লনাও বলা হয়।

নদীটিকে এ জন্য হলুদ নদী বলা হয় যে, বিশ্বের সমস্ত নদীর তুলনায় এতে অধিক পলি জমে। এই নদী প্রতিবছর ১ শত ৬০ কোটি টন পলি প্রবাহিত করে জিরি প্রান্তর পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে এর প্রবাহ শিথিল হয় এবং নীচে কাদা জমতে থাকে। এই কাদা ও পলির কারণে নদী এত উপরে উঠে এসেছে যে, এর পাড়ে উঁচু উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে এবং নদীটি ভূপৃষ্ঠ থেকেও উঁচু হয়ে গিয়েছে।

হলুদ নদীর প্লাবনের কারণে বেশির ভাগ সময় বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। বলা হয় যে, নদীটি তার ইতিহাসে ২৬ বার দিক বদল করেছে, যার ফলে চীনা জনসাধারণকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। এমনকি তার উপাধি 'চীনের মারাত্মক ক্ষত' প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। পরিশেষে সরকার নদীর উৎসমুখে এবং তার মধ্যবর্তী প্রান্তরসমূহে পানি ধারণের জন্য বড় বড় প্লান্ট নির্মাণ করেছে এবং নিম্নপ্রান্তরসমূহে মজবুত বাঁধ নির্মাণ করেছে। ফলে নদীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

কাংসু প্রদেশের মোট বসতি ১ কোটি ৯০ লক্ষ। যার মধ্যে ১২ লক্ষ লোক মুসলমান। গোটা প্রদেশে প্রায় ১২শ মসজিদ রয়েছে। এই প্রদেশের রাজধানী লাং চুর জনবসতি ১২ লক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা ৭০ হাজার।

পঞ্চাশোর্ধ বড় মসজিদ রয়েছে। হলুদ নদীর পাড়ে অবস্থিত এখানকার প্রধান মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইমাম প্রশিক্ষণের জন্য একটি মাদ্রাসাও রয়েছে। এখানে ৫ বছর মেয়াদী সেই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ দান করা হয়, যা বেইজিং এর মাদ্রাসাগুলোতে চালু আছে। মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক শায়েখ ইউনুছ ইয়াং সান একজন নূরানী চেহারার বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি সুন্দর আরবী বলেন। বেশভূষা থেকে নিয়ে চালচলন ও অঙ্গভঙ্গিতেও সলফে সালেহীন (নেককার পূর্বসূরীদের) নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কাংসু প্রদেশের চায়না মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতি। কাংসু প্রদেশের সম্পূর্ণ সফরেই তিনি আমাদের সঙ্গে বরং অধমের গাড়ীতেই অবস্থান করেন। ভ্রমণকালে তার নিকট থেকে অনেক বিষয় জানতে পারি। তিনি ফেকাহ সংক্রান্ত অনেক মাসআলা নিয়েও আলোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে চীনে মুসলমানদের অবস্থা অনেক ভাল। এতে মুসলমানগণ অনেক আনন্দিত। অধমের বারংবার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, এখানকার আলেমদের মূল সমস্যা ইসলামী গ্রন্থের স্বল্পতা। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস বিষয়ে শুধুমাত্র 'মেশকাত' ও 'আললু'লুয়ু ওয়াল মারজমান' গ্রন্থ রয়েছে, এছাড়া হাদীসের কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থ আমার নিকট নেই। ফেকাহ বিষয়ে শুধুমাত্র শরহে বেকায়া ও রদ্দুল মুহতার রয়েছে, এছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই।

তার থেকে এই দুঃখজনক বিষয়টিও জানতে পারি যে, এখানকার মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন ফেকাহ ভিত্তিক ও আকায়েদ ভিত্তিক মতবাদ বিষয়ে দলাদলি ও বিবাদও বর্তমান রয়েছে। যেমন ঃ 'ইসতিওয়া আলাল আরশ' এর সরূপ, 'রফে ইয়াদাইনের' মাসআলা ও মিলাদ বৈধ অবৈধ হওয়া ইত্যাদি। এজন্য আফসোস হল যে, এমন একটি দেশে যেখানে মুসলমানদের প্রকৃত সমস্যা, নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচানো এবং নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সেভাবে প্রতিপালন করা, সেখানে এ জাতীয় বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও বিতর্কও হয়ে থাকে। আরো জানতে পারি যে, বিষয়গুলো অতি সম্প্রতি কোন এক ব্যক্তি এ অঞ্চলে উঠিয়েছে। অন্যথা এখানকার মুসলমান, যারা শতকরা ১০০ ভাগ হানাফী

মাযহাবের অনুসারী, ইতিপূর্বে সহজ সরল পন্থায় নিজেদের দ্বীনের উপর আমল করে আসছিল। মুসলমানদের মাঝে এরূপ বিতর্কিত মাসআলা তুলে ধরে তাদের সংহতিতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের জন্য হেদায়েতের দুআ করা ছাড়া আর কিবা করা যেতে পারে? আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সঠিক বুঝ এবং সঠিক চিন্তা দান করুন। আমীন।

রাত প্রায় আটটায় আমরা লাং চু শহরে প্রবেশ করি। এখানকার স্থানীয় একটি হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই হোটেলের ড্রইংরুমে কাং চু প্রদেশের উপ–গভর্নর জনাব শরীফ নেয়া সাহেব প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারার একজন মুসলমান। তাঁর সঙ্গে সেখানেই কিছু সময় কথাবার্তা চলে। পরে সেই হোটেলের রেস্তোরাঁতে তিনি প্রতিনিধিদলের সম্মানে নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। নৈশভোজে শহরের অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে জনাব হাবীবুল্লাহ মাসুলিন, শেখ ইউনুস ইয়ান সান এবং লাং চুর মসজিদসমূহের ইমাম সাহেবগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনাব শরীফ নেয়া সাহেব (উপ–গভর্নর কাং চু প্রদেশ) নৈশভোজ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান সরকার চীনা মুসলমানদের হজ্জের ব্যবস্থাপনা করায় বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি নিজেও আগামী বছর হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি খাবার চলাকালীন সময় কাং চু প্রদেশের মুসলমানদের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরেন। রাত প্রায় এগারোটায় এই মনোমুগ্ধকর বৈঠক সমাপ্ত হয়।

লিনসা ভ্রমণ

পরদিন প্রত্যুষে আমরা কাং চু প্রদেশের আরেকটি শহর লিনসাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। শহরটি সেই প্রেফিকচার (ডিভিশন) এর সদর অঞ্চল। লাং চু থেকে এই শহরের পথ প্রাইভেট কারযোগে প্রায় পাঁচ ঘন্টার পথ। লাং চু থেকে শায়েখ ইউনুস বাঁসীন (চায়না মুসলিম এসোসিয়েশনের প্রাদেশিক সভাপতি), জনাব হাবীবুল্লাহ মাসুলিন (প্রাদেশিক রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ–সভাপতি) এবং আর

একজন সহ–সভাপতি ইউসুফ মাত্বীনও আমাদের সঙ্গী হন। এভাবে পাঁচটি প্রাইভেট কার ও একটি ওয়াগন এর এই কাফেলা লাং চু থেকে সড়ক পথে রওয়ানা হয়। পথটি বেশির ভাগ পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করছিল। শীত প্রচণ্ড হলেও মনোরম ছিল। তাপমাত্রা শূন্যেরও অনেক নীচে ছিল। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের উপর এবং উপত্যকায় তুষারপাত হচ্ছিল। প্রায় দু' ঘন্টা চলার পর একটি নদী (থাং খা নদী) পার হয়ে সম্মুখে কয়েকটি জীপ ও একদল মানুষ দাঁড়ানো দেখতে পাই। তারা হাত উঠিয়ে আমাদের গাড়ী থামায়।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, এরা সকলে লিনসা শহরের লোক। থাং খা নদীর তীর থেকে লিনসা বিভাগের সীমানা শুরু হয়, তাই এরা প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এখানে এসেছে। তাদের মধ্যে লিনসা বিভাগের কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ এবং লিনসা শহরের মসজিদসমূহের ইমাম ও খতীব সাহেবগণ শামিল ছিলেন। এখান থেকে লিনসা শহর প্রায় তিন ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত। এদের এ সময় এখানে উপস্থিত থাকার অর্থ এরা ফজরের অনেক পূর্বে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে জীপে করে রওয়ানা হয়েছেন। তাদের এই অতি উষ্ণ ভালবাসা আমাদেরকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। ভাষা না জানার কারণে তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাদের চেহারায় ভালবাসা ও একনিষ্ঠতার যে ঝলক ছিল, তা ভাষায় প্রকাশের ঊর্ধ্বে ছিল। গাড়ী থেকে নেমে তাদের সাথে কোলাকুলি করার এবং ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণভাবে 'আসসালামু আলাইকুম' এর ও সার্বজনীন শব্দ দ্বারা সালাম জানানোর দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য ছিল।

এখান থেকে আমাদের কাফেলায় আরো তিনটি জীপ যোগ হয়। আট গাড়ীর এই কাফেলার সর্বাগ্রে বিভাগীয় কমিশনারের গাড়ী পাইলটের দায়িত্ব পালন করছিল। আমাদের এ কাফেলা যে গ্রামই অতিক্রম করত, সেখানেই বিরাট সংখ্যক সাধারণ জনতা আমাদের নিকট হতে দুআ নেওয়ার জন্য একত্রিত হত। জনসাধারণের অধিকাংশের মাথার গোল টুপি তাদের মুসলমান হওয়ার পরিচয় বহন করছিল। মনে হচ্ছিল যেন,

তারা কোনভাবে প্রতিনিধিদলের আগমন সম্পর্কে অবগত হয়েছে। তাই যেখান দিয়েই আমাদের কাফেলা অতিক্রম করত, সেখানেই লোকেরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাত। 'লিনসা' কাংসু প্রদেশের এমন একটি বিভাগ, যার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। এজন্য বিভাগটিকে 'চীনের মক্কা' বলা হয়। এর লোকসংখ্যা ১৪.৩ লক্ষ, যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৭.৫ লক্ষ বলা হয়। অর্থাৎ এখানে প্রায় ৫২.৫ শতাংশ মুসলমান। শুধুমাত্র এ বিভাগেই ১৭১৫টি মসজিদ রয়েছে। কিন্তু অধমের অনুমান এই যে, ধর্মভিত্তিক আদমশুমারী না থাকার কারণে এই সংখ্যা ও গণনা পরিপূর্ণ সঠিক নয়। সম্ভবত এখানকার অধিবাসী মুসলমানের আনুপাতিক হার ৫২ শতাংশেরও অনেক বেশি হবে। কেননা পথে যত গ্রাম আমাদের সামনে এসেছে, তার প্রতিটি জায়গায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশি মনে হচ্ছিল।

মুসলমানের পরিচয় তাদের টুপির কারণে সহজেই বুঝা যেত, আর মুসলমান নারীদের পরিচয় পাওয়া যেত তাদের মাথায় ব্যবহৃত ওড়না থেকে। বোরকা ও নেকাব ইত্যাদির ধারণা এদের নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মাথায় ওড়না ব্যবহার করা হয়। ওড়না ব্যবহারের মধ্যেও এই মহিলারা এমনভাবে শ্রেণী বন্টন করে রেখেছে, যা অন্য কোন অঞ্চলে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এখানকার নিয়ম এই যে, কুমারী নারীরা মাথায় সবুজ রঙ্গের ওড়না ব্যবহার করে, বিবাহিতা ও মধ্যবয়স্কা মহিলারা কালো ওড়না ব্যবহার করে এবং বৃদ্ধা মহিলারা সাদা ওড়না ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত কোন মহিলার নাতিপুতি হলে তখন সে কালো ওড়নার জায়গায় সাদা ওড়না ব্যবহার শুরু করে। পথে সবুজ ওড়না পরিধেয় নারীদের খুব কম চোখে পড়ে। বেশির ভাগ কালো ও সাদা ওড়না পরিহিতা মহিলাদের দেখা যায়। সম্ভবত এর অর্থ এই যে, কুমারী নারীদেরকে সাধারণত বাড়ীর বাহিরে বের করা হয় না।

মোটকথা, পুরুষদের টুপি ও মহিলাদের ওড়না দ্বারা এ বিষয় অনুমান করা খুব কঠিন নয় যে, এ অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি।

রাস্তার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে অনেক মসজিদ দেখতে পাই।

মেজবানগণ পথে খানলো কাউন্টির একটি গ্রামে প্রায় আধা ঘন্টার জন্য বিরতি করেন। আমাদের গাড়ীর বহর গ্রামে প্রবেশ করতেই রাস্তার দুদিকে দাঁড়ানো মুসলমানগণ সমস্বরে আসসালামু আলাইকুম বলে ওঠে। শত শত মুসলমান নাজানি কখন থেকে এই কাফেলার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। আমরা গাড়ী থেকে নামলে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করার জন্য তাদের প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাদের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত ছিল। তাদের চেহারায় সেই অস্থিরতা স্পষ্ট পাঠ করা যাচ্ছিল, যা আনন্দ ও ভালবাসা প্রকাশের উপযুক্ত পথ হাতে না পাওয়ায় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এটি শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত পশ্চাদপদ অঞ্চলের ছোট একটি গ্রাম। যার বসতি হয়ত আট দশ হাজারের অধিক হবে না। গ্রামের অধিকাংশ বাড়ী জরাজীর্ণ। পথ কাঁচা ও জায়গায় জায়গায় কাদায় ভরা। অধিবাসী বেশির ভাগই দরিদ্র। কিন্তু এখানে মনোরম ও প্রশস্ত বড় দুটি মসজিদ রয়েছে। পূর্বে মসজিদ দুটি খুব ছোট ছিল। সম্প্রতি দেড় দু' বছর হলো এগুলো পাকা করে নির্মাণ করা হয়েছে। ইমাম সাহেব বললেন যে, এখানে ছোট একটি মাদ্রাসাও আছে। এতে পবিত্র কুরআন ও প্রাথমিক ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। অধিকাংশ তরুণ ছাত্র মাথায় খুব সুন্দর সাদা পাগড়ী বেঁধেছিল।

আজ জুমুআর দিন। লিনসা শহরে আমাদেরকে জুমুআর নামায আদায় করতে হবে। এজন্য গ্রামে সংক্ষিপ্ত অবস্থান এবং উভয় মসজিদে অল্প অল্প সময় কাটিয়ে আমরা পুনরায় যাত্রা করি।

লিনসার জামে মসজিদে জুমুআর নামায

তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়সমূহের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করতে করতে দুপুর একটার কিছু পূর্বে আমরা লিনসা শহরে প্রবেশ করি। এখানকার একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সরকারী রেষ্ট হাউজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উযূ করেই আমরা জুমুআর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে জামে মসজিদের দিকে রওয়ানা হই। জামে মসজিদটি শহরের বড় মাঠের একেবারে নিকটে অবস্থিত। আমাদের কাফেলা এখানে পৌঁছলে লোকদের

মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাসের যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, তা দেখার মত ছিল। মসজিদের অনেক দূর থেকে মুসলমানগণ দুই সারিতে দাঁড়িয়েছিল। অনেক লোক আশেপাশের প্রাচীর ও বিল্ডিংসমূহে আরোহণ করেছিল। মসজিদের প্রাঙ্গণ, বারান্দা ও ভিতরের অংশ মাশাআল্লাহ নামাযী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

জুমুআর পূর্বে মসজিদের ইমাম সাহেব চীনা ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন তারপর আমি অধম বক্তৃতা প্রদান করি। পাকিস্তানী দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী মিঃ হাসান জাবিদ চীনা ভাষায় তা অনুবাদ করে শুনান। তিনি বেইজিং থেকে সফরে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। আমি মিম্বার থেকে তাকিয়ে দেখি, মাশাআল্লাহ! মসজিদ মুসল্লী দ্বারা একেবারে পরিপূর্ণ এবং কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। দরজা ও সিঁড়িতেও লোক বসা আছে। সামনের সড়ক পর্যন্তও মানুষ দেখা যাচ্ছে। আমার সতর্ক অনুমানে মনে হচ্ছিল, ৭/৮ হাজারের কাছাকাছি জনসমাগম হয়েছে। অধম বক্তৃতায় মুসলমানদেরকে নিজেদের দ্বীন ঈমান সংরক্ষণ করা এবং এই সুদূর অঞ্চলে ইসলামের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য মুবারকবাদ জানাই। পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে তাদেরকে ভালবাসার পয়গাম পৌছে দেই এবং এই বিষয়ে বিশেষভাবে তাকিদ করি যে, তারা যেন ঈমানের এই পবিত্র আমানত তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত সযত্নে পৌছে দেওয়ার জন্য দ্বীনী তালিমের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দান করেন।

অধমের বক্তৃতার পর মুফতী মুহাম্মাদ হুসাইন নাঈমী সাহেবও তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় চীনা মুসলমানদের আবেগ ও ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তারপর ইমাম সাহেব আরবীতে খুৎবা দান করেন। খুৎবা বিশুদ্ধ ও সাহিত্যমানসম্পন্ন আরবী ভাষায় ছিল। ইমাম সাহেবের খুৎবা পাঠের ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি খুৎবার অর্থ বুঝে পাঠ করছেন।

অধমকে শেখ ইউনুস ইয়ান সান বলেছিলেন যে, এ অঞ্চলের মুসলমানগণ জুমুআর পর সুন্নাত ছাড়াও সতর্কতামূলক জোহরের চার

রাকাত নামায পড়তে অভ্যস্ত। জামাতের পর মসজিদ থেকে বের হতে অনেক দেরী হয়ে যায়। কারণ অধিকাংশ লোক জামাতের পর দশ রাকাত নামায আদায় করছিল। আমি শায়েখ ইউনুসের নিকট আরজ করি যে, শরীয়তে সতর্কতামূলক জোহরের নামায পড়া পছন্দনীয় নয়। লোকদেরকে ধীরে ধীরে সুন্দররূপে এমনভাবে এ বিষয়টি বলে দেওয়া জরুরী, যাতে কোন বিশৃংখলা বা বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়। শেখ ইউনুসের আদেশে আমি মাসআলাটি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের উদ্ধৃতিসমূহ তুলে ধরি। তিনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং সে অনুপাতে আমল করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

জুমুআর নামাযের পর উপস্থিত লোকেরা মুসাফাহা ও মুয়ানাকা (আলিঙ্গন) করার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই মসজিদের মেহরাব থেকে গাড়ী পর্যন্ত পৌছতে অনেক সময় লেগে যায়। এ সময় ভালবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এখানকার লোকেরা মুসাফাহা করে। যা দেখে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই হাত মিলানোর জন্য আমার অন্তর চাচ্ছিল। আল্লাহ জানেন, তাঁর কোন বান্দার হাতের বরকতে তিনি আমাদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।

যেই ধৈর্য সংকুল অবস্থা পার করে এরা নিজেদের দ্বীন ঈমান বাঁচিয়ে এসেছে, সেদিকে লক্ষ্য করলে এদের ঈমানের স্বাদ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হাসিল হয়েছে বলে মনে হয়। যখন এ চিন্তা মনে আসে, তখন তাদের প্রত্যেকের হাত চুম্বন করতে মন চায়। হয়ত এরা ইতিপূর্বে চীনের বাইরের কোন মুসলমান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের এমন সুযোগ লাভ করেনি। হয়ত বহু বছর পর চীনের বাইরের মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি অধম এই জামে মসজিদে বক্তৃতা দান করি। তাই এদের ভালবাসার আবেগ অনুমান করা কঠিন ছিল না।

জুমুআর নামাযের পর রেষ্ট হাউজে গিয়ে দুপুরের খাবার খাই। এরপর অনতিবিলম্বে লিনসার অন্যান্য মসজিদে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। লিনসা শহরে মোট ১৬টি বড় মসজিদ আছে। তার মধ্য থেকে পর পর তিনটি মসজিদে যাওয়ার সুযোগ হয়। সব জায়গায় মুসলমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সেই দৃশ্য দেখতে পাই, যেমনটি জামে মসজিদে

দেখেছিলাম। তিনটি মসজিদেই দ্বীনী তালিমের বন্দোবস্ত আছে। প্রতিটি মসজিদই খুব জাঁকজমকপূর্ণ। সরকারের সাহায্যে সেগুলো গত দেড় দুই বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে।

মেজবানগণ মসজিদের বাইরে স্থানীয় একটি কারখানা পরিদর্শনের প্রোগ্রাম রেখেছিলেন। এটি বিরাট বড় একটি কারখানা। এতে ধ্বনি (মাইক) ও প্রতিবিম্ব (ফটো) বিষয়ক যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী তৈরী হয়। কারখানার বিভিন্ন অংশ কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। এখানে মিসাইলের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্যামেরা, ছোট বড় টেপ রেকর্ডার, তাতে ব্যবহৃত মেশিনারী ও অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করা হয়। কারখানার ম্যানেজার বিভিন্ন জিনিস দেখাতে দেখাতে বলেন যে, এসব বস্তু চীনেরই আবিস্কার এবং এখনও বিশ্বের অন্য কোথাও প্রস্তুত হয় না।

কারখানার কারিগরী মান সম্পর্কে তো এ বিষয়ের কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই মতামত প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে একে কারিগরী অঙ্গনের খুব উঁচু মানের কারখানা বলে মনে হচ্ছিল। অধমকে যে জিনিসটি খুব বেশি প্রভাবিত করে, তা কারখানার ঘর এবং তার কর্মচারীদের সরলতা। ঘরটি এমন যে, বাইর থেকে কেউ অনুমানই করতে পারবে না যে, এটি বিরাট বড় একটি কারিগরী প্রতিষ্ঠান। পুরা কারখানাতে আরাম আয়েশ ও সাজসজ্জার কোন সামগ্রী চোখে পড়েনি। পুরাতন ধাঁচের বিল্ডিং। এর ফ্লোর পর্যন্ত সাদা সিমেন্টের তৈরী। অফিস কক্ষগুলো সাধারণ মানের, কিন্তু এতে শিল্প ও কারিগরী দিক থেকে বিরাট বড় কাজ সম্পাদিত হচ্ছে। এর সমস্ত সম্পদ ও উপকরণ তার আসল কাজে ব্যয় হচ্ছে। হায়! সামর্থ্য বুঝে পদক্ষেপ গ্রহণের এই সোনালী মূলনীতি, যা মূলত ইসলামের শিক্ষা—যদি আমরাও বাস্তবায়ন করতে পারতাম।

এ দিনটি শেষ হয় একটি সুদৃশ্য পার্কে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। লিনসা বিভাগের কমিশনার প্রতিনিধিদলের সম্মানে এর আয়োজন করেছিলেন। কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার উভয়ই মুসলমান। লিনসার বর্ডার থেকে তাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখানে ডেপুটি কমিশনার অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ ও আবেগময় ভাষণ দান করেন।

অধমও তার উত্তরমূলক বক্তৃতায় নিজের ভ্রমণের প্রতিক্রিয়াসমূহ কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করি। কিন্তু তা এই স্বীকারোক্তি সহকারেই যে, আনন্দ ও ভালবাসার যে আবেগ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হচ্ছে, তা প্রকাশ করার জন্য আমাদের নিকট যথাযথ শব্দ ভাণ্ডার নেই।

মাগরিব নামায পার্কেই আদায় করার পর আমরা অবস্থান স্থলের দিকে ফিরে আসি। এশার পর খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেই। দীর্ঘ ভ্রমণ এবং একাধারে প্রোগ্রামের ক্লান্তি আমাদেরকে অতিসত্বর বিছানামুখী হতে বাধ্য করে।

সাংহাই এর ভ্রমণ

নভেম্বরের ৯ তারিখের খুব ভোরে নাস্তা করার পর আমরা লিনসা থেকে সাংহাই প্রদেশের রাজধানী সিনাং অভিমুখে যাত্রা করি। লিনসার মেজবানগণ, যাদের মধ্যে লিনসার কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, ধর্ম বিভাগের ডিরেক্টর ও চায়না মুসলিম এসোসিয়েশনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁরা আমাদেরকে লিনসাতে বিদায় দিয়ে আরাম করতে প্রস্তুত হননি বরং অনেক কষ্ট সহ্য করে আমাদের সাথে কাংসু প্রদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত এসেছেন।

লিনসা থেকে সীনাং যাওয়ার পথে বিশাল কয়েকটি পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যেগুলো তখন বরফে ঢাকা ছিল। এরই একটি পাহাড়ের নাম লাচী। এর শৃঙ্গ এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩৫৬০ মিটার। এই শৃঙ্গটি কাংসু ও সাংহাই প্রদেশের মাঝে সীমান্ত রেখার কাজ করে। সড়কের উভয় দিকের পাহাড় সড়কের প্রান্ত পর্যন্ত বরফের সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে আছে। বরফের এই প্রান্তরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে কয়েকটি জীপ, প্রাইভেট কার ও একটি জনসমাবেশ দৃষ্টিগোচর হয়।

এরা সাংহাই প্রদেশের লোক। সীনাং থেকে প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এসেছেন। নাজানি কখন থেকে তারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। এদের মধ্যে সাংহাই প্রদেশের মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতি শায়েখ আবদুল্লাহ, প্রাদেশিক পররাষ্ট্র বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ

ভাং ইয়ান (যার মর্যাদা প্রাদেশিক মন্ত্রীর সমান, কারণ, চীনে প্রাদেশিক মন্ত্রীর কোন পদ নেই। তার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানকে ডিরেক্টর বলা হয়) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক কমিশনের ডিরেক্টর মিঃ লাবেন লি ও ধর্ম বিষয়ক সহকারী পরিচালক মিঃ মালীন লু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখান থেকে সীনাং প্রায় পাঁচ ঘন্টার পথ। অতএব এ সময় এদের এখানে উপস্থিত থাকার অর্থ এরা রাত চারটায় সীনাং থেকে রওয়ানা হয়েছেন।

এখানে লিনসার চেয়েও অনেক বেশি শীত। এরা প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যের সাময়িক ব্যবহারের জন্য একটি করে ওভারকোট সঙ্গে এনেছিলেন। আমরা গাড়ী থেকে নামতেই সেগুলো তারা আমাদের পরিয়ে দেন। প্রত্যেকটি ওভারকোট ন্যূনতম ছয় সাত সের ওজনের হবে। পরে শীত অনুভব করার পর বাস্তবিকই এর প্রয়োজনিয়তা বুঝে আসে। যেসব গরম কাপড় আমরা সঙ্গে এনেছিলাম, তার মূল্য এখানে কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত আমরা কাংসু প্রদেশের গাড়ীতে ভ্রমণ করছিলাম। সাংহাই এর মেজবানগণ তাদের সঙ্গে গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। কাংসুর মেজবানগণ এখানে আমাদের নিকট হতে বিদায় নেন। এবার নতুন গাড়ীতে ভ্রমণ শুরু হয়। গাড়ীতে আমার সঙ্গে এখন শায়েখ ইউনুসের পরিবর্তে শায়েখ আবদুল্লাহ আছেন। তিনি সাংহাই প্রদেশে মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতি।

সালার জেলায়

বরফাচ্ছাদিত পর্বতচূড়ার বন্ধুর পথ অতিক্রম করে প্রায় একঘন্টা পর আমরা ছোট একটি উপশহরে প্রবেশ করি। শহরটি সালার নামে প্রসিদ্ধ। মেজবানগণ এখানকার মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ পরিদর্শনের পর এখানেরই একটি গ্রামীণ বাড়ীতে দ্বিপ্রহরের খাবার খেয়ে সম্মুখে রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম করেন। সালার নামের এই জেলাটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি জেলা। এখানে ৬০ হাজার মুসলমান রয়েছে। এর মধ্যে একান্ন হাজার সালার সম্প্রদায়ের লোক এবং নয় হাজার হুই সম্প্রদায়ের লোক।

এই একটি জেলাতেই ৯৪টি মসজিদ রয়েছে। যখন আমাদের গাড়ীর বহর শহরে প্রবেশ করে, তখন সড়কের উভয় দিকে মুসলমানদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো দেখতে পাই। নাজানি কখন থেকে এরা এভাবে প্রতীক্ষা করছে। গাড়ী থেকে নামার পর জেলার মেয়র সালেহ সাহেব, ডেপুটি কমিশনার খানশাভীন সাহেব ও এখানকার জামে মসজিদের ইমাম শায়েখ সাঈদ হাসান প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। এখানে আমরা দুইটি মসজিদ পরিদর্শনে যাই। উভয় মসজিদই জাঁকজমকপূর্ণ এবং বিশাল। মসজিদের সঙ্গে ছোট ছোট মাদ্রাসাও রয়েছে।

সাংহাই প্রদেশে চীনের বাইরের কোন প্রতিনিধি দল কখনও আসেনি। বরং এ অঞ্চলে ভিনদেশীদের আগমন নিষিদ্ধ ছিল। অল্পকাল পূর্বে প্রদেশটি ভিনদেশীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তাই এখানকার অধিকাংশ মুসলমান চীনের বাইরের কোন মুসলমানের চেহারা আজ পর্যন্ত দেখেনি। এই প্রথমবার বাইরের কিছু মুসলমানকে দেখার জন্য তাদের অস্থির আবেগ ও আগ্রহ উপভোগ্য ছিল। মুসাফাহার সময় অনেকের চোখে অশ্রু উছলে উঠতে দেখা যায়। ইমাম সাহেব যখন তার অভ্যর্থনা ভাষণে এ বিষয়ে পাকিস্তানের শুকরিয়া আদায় করেন যে, তারা চীনের মুসলমানদের হজ্জ গমনের ব্যবস্থা করেছে, তখন আমি একজনকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে দেখেছি। নাজানি সুদূরে অবস্থিত এই মুসলমানগণ কতদিন ধরে বাইতুল্লায় হজ্জ করার বাসনা আপন বক্ষে লুকিয়ে লালন করছেন। নাজানি কত মানুষ এই বাসনা হৃদয়ে নিয়েই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। এখন আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য হজ্জ করার পথ সুগম করে দিয়েছেন। তাই তাদের অন্তর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার আবেগে পরিপূর্ণ। তারা এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতেও ক্লান্ত হয় না। তারা ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়ার কারণে কথার মাধ্যমে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করতে অক্ষম। কিন্তু তাদের একনিষ্ঠতা ও ভালবাসাপূর্ণ চেহারা অন্তরের উপাখ্যান শুনানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। তাদের চোখে উছলে ওঠা অশ্রু তাদের নিষ্ঠার সেই পুঁজি, যা তারা তাদের ভিনদেশী ঈমানী ভাইদের সম্মুখে উৎসর্গ করছিল। অতীতের হৃদয় বিদারক কত ধৈর্য সঙ্কুল অবস্থার উপাখ্যান সেই অশ্রুতে লুকিয়েছিল, তা

কল্পনা করতেও কলিজা বের হয়ে আসে। তাওহীদের সেই সন্তানদেরকে মুবারকবাদ, যারা বীরত্বের সাথে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করেছেন এবং স্বীয় দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করে সহীহ সালামতে বর্তমান কাল পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আর নাজানি কতকাল পর আজ তাদের ভিনদেশী কোন ভাইয়ের সম্মুখে নিজের আবেগসমূহ নীরবে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন।

এখানকার একটি মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের সীমানায় দুটি মাজার দেখতে যাই। মাজার দুটি সেই মুসলমানদ্বয়ের শেষ আরাম গাহ, যারা এ শহরে ইসলামের আলো বিতরণের উসীলা ছিলেন। স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, এরা কারমান ও আখমান নামীয় দুই ভাই ছিলেন।[১]

এরা দু'জনে মূলত সমরকন্দের বাসিন্দা ছিলেন। একসময় সমরকন্দের শাসক তাদের শত্রু হয়ে গেলে তারা উটে আরোহণ করে দেশ ত্যাগ করেন। এখানে একটি ঝর্ণা ছিল। তারা এখানে বিশ্রাম করার জন্য অবতরণ করেন। পুনরায় যখন উটে আরোহণ করে ভ্রমণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন উট সামনে চলতে অস্বীকার করে। তারা একে এ স্থানেই তাদের অবস্থান করার জন্য অদৃশ্যের ইঙ্গিত মনে করেন। প্রাচীনকালের নিয়মানুসারে তারা সঙ্গে করে সমরকন্দের মাটি ও অল্প পানি নিয়ে এসেছিলেন। তারা এ জায়গার মাটি ও পানি পরীক্ষা ও পরিমাপ করে তা সমরকন্দের মাটি ও পানির সমমানের পান। এতে করে তাদের এখানে অবস্থান করার ইচ্ছা আরো মজবুত হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এখানেই অবস্থান করেন। বর্তমানে সালার সম্প্রদায়ের সকল লোক তাদেরই বংশধর।

মসজিদের অদূরে কাঠ দ্বারা একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। যা এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের এখানে অবস্থানের স্মৃতি বহন করছে। এরই নীচে একটি পুকুর রয়েছে, যার পাড়ে একটি উটের প্রতিকৃতি উল্লেখিত ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ বানানো হয়েছে।

টীকা ঃ ১. হয়ত তাদের প্রকৃত নাম কাহরমান ও আবদুর রহমান।

মসজিদ, মাদ্রাসা ও মাজারসমূহ পরিদর্শন করার পর মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদেরকে গ্রামের ভিতর স্বগৃহে নিয়ে যান। গৃহটি বাইর থেকে কাঁচা চার দেওয়ালে ঘেরা। কিন্তু ভিতরাংশ অনেক প্রশস্ত, আরামদায়ক ও সুদৃশ্য। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা এখানেই করা হয়। ইমাম সাহেব সালার সম্প্রদায়ের বিশেষ খাবার রান্না করিয়েছিলেন, যা চীনের সাধারণ খাবার থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের এবং এর কোন কোন জিনিসের সঙ্গে পাকিস্তানী খাবারের কিছুটা মিল রয়েছে। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চীনা খাবার পাকিস্তানী খাবার থেকে এত বেশি ব্যতিক্রম যে, উভয়ের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। সম্ভবত সালার সম্প্রদায়ের খাদ্যে সমরকন্দের খাদ্যের রং ও চেহারা এসে থাকবে। যে কারণে তার মধ্যে চীনের সাধারণ খাদ্য থেকে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

শিনং শহরে

আমরা যখন শিনং শহরে প্রবেশ করি তখন মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছে। এটি কয়েক জেলার সমন্বিত জাঁজমকপূর্ণ উন্নয়নশীল একটি শহর। শহরের পশ্চিমের উন্নতমানের একটি সরকারী রেষ্ট হাউজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রেষ্ট হাউজটি আরাম আয়েশের আধুনিকতম সামগ্রীতে সজ্জিত। মাগরিব নামাযের পরই সাক্ষাত কক্ষে সাংহাই প্রদেশের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ সিন লিয়াং (অমুসলিম), ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আইয়ূব আইন ইয়ান শুয়া (মুসলিম), প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ মাটার খু (অমুসলিম), ধর্ম বিষয়ক অধিদপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ থাওশো জিয়ান (অমুসলিম) ও চায়না মুসলিম এসোসিয়েশনের ভাইস সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মাতিফা (মুসলিম) প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। এ সময় সাংহাই সীমান্ত থেকে যারা আমাদের সাথে এসেছিলেন তাঁরাও উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে চীনের মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় হয়।

এই সাক্ষাতের পরপরই মিঃ সিন লিয়াং (রাজনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান) এই রেষ্ট হাউজেরই ডাইনিং হলে প্রতিনিধি দলের

সম্মানে নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। রাত প্রায় সাড়ে দশটায় সেখান থেকে অবসর হই। পরদিন সকালে নাস্তার পর আমরা শিনং এর সর্ববৃহৎ মসজিদ পরিদর্শনে যাই। শিনং শহরের মোট জনবসতি ৫ লক্ষ। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার বলা হয়। শহরে মসজিদের সংখ্যা ৩৫টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন মসজিদটিকে তুং কুয়া জামে মসজিদ বলা হয়। এই মসজিদটি পাঁচশ বছরের প্রাচীন। সভ্যতার বিপ্লব সমাপ্তির পর বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করে মসজিদটি সংস্কার করা হয়। তাতে মুসলমানদের নিজস্ব চাঁদা ছাড়া সরকারও বিরাট অংকের আর্থিক সাহায্য করেন। মসজিদের বিস্তৃতি, কারুকার্য, সৌন্দর্য ও সুব্যবস্থাপনা দেখে মন আনন্দে ভরে যায়। প্রাদেশিক মুসলিম এসোসিয়েশনের সভাপতি শায়েখ আবদুল্লাহ শান শিয়ান কুই—যিনি সাংহাই সীমান্ত থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনিই এই মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করছেন।

মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসাও রয়েছে। সেখানে মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছয় মাস। এখানে শুধুমাত্র তাদেরকেই ভর্তি করা হয়, পূর্ব থেকে যাদের আরবী ভাষার প্রাথমিক বিষয়ে জ্ঞান আছে। দৈনিক ছয়টি দরসে মেশকাত, জালালাইন ও শরহে বেকায়ার বিরাট অংশ পড়ানো হয়। আমরা মাদ্রাসায় গিয়ে দেখি মেশকাত শরীফের দরস চলছে। ছাত্রসংখ্যা আনুমানিক ৩৫/৪০ জন। শিনংএ এ সময়ে তাপমাত্রা হিমাংকেরও নয় ডিগ্রী সেঃ এর নীচে ছিল। তীব্র শীতের কারণে শ্রেণীকক্ষের মাঝ বরাবর ঢাকনা পরানো বিরাট আংটা (এক ধরনের চুল্লি বিশেষ, যা গরম করার জন্য ব্যবহৃত হয়) জ্বালানো হয়েছিল। যে কারণে শ্রেণীকক্ষের তাপমাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। উস্তাদ ও ছাত্রদের সঙ্গে আমরা আরবীতে কথা বলি। কোন কোন ছাত্র ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

অধমের এক প্রশ্নের উত্তরে স্থানীয় লোকেরা বলেন ঃ এখানকার মসজিদসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য মুসলমানদের একটি কমিটি থাকে। মসজিদের আমদানীর চারটি উৎস আছে। প্রথমতঃ মুসলমানদের নিজস্ব চাঁদা। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন মসজিদ সরকারের পক্ষ থেকেও সাহায্য

পায়। তৃতীয়তঃ চীনের বাইরের কোন কোন মুসলিম সংস্থা কোন কোন মসজিদের আর্থিক সাহায্য করে থাকে। চতুর্থতঃ মসজিদের সাথেই কিছু স্থায়ী আমদানীর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়। বেশির ভাগ মসজিদে অনেকগুলো টয়লেট তৈরী করা হয় এবং জনসাধারণ থেকে তা ব্যবহার করার ফিস নেওয়া হয়। সেগুলো মসজিদের ব্যয়ের খাতে খরচ করা হয়।

তুং কুয়া জামে মসজিদের এ ধরনের অনেকগুলো পরিচ্ছন্ন টয়লেট রয়েছে। উযূর ব্যবস্থাও খুব উন্নত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া মৃতদের গোসল দেওয়ার জন্য মসজিদ সংলগ্ন একটি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে পাথরের দুটি পৃথক খাট বানানো হয়েছে। একটি পুরুষদেরকে গোসল করানোর জন্য, অপরটি মহিলাদের জন্য। আমি অন্য কোন দেশে এরূপ ব্যবস্থাপনা দেখিনি।

ইমাম সাহেব বললেন, মসজিদ সংলগ্ন মোটামুটি বড় একটি গ্রন্থাগারও রয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের সময় তার যথাযথ সংরক্ষণ করতে না পারায় এখন তা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে সেখান থেকে আর জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয় না। আসলে বিপ্লবের পূর্বে এই মসজিদ বড় একটি মাদ্রাসা ছিল। এই গ্রন্থাগার সে যুগেরই স্মৃতি।

বেইজিংএ প্রত্যাবর্তন

তুং কুয়া জামে মসজিদ দেখা শেষ হয়েছে। শিনং থেকে আমাদের ফেরার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখান থেকে আমাদেরকে বেইজিং যেতে হবে। কিন্তু শিনং থেকে বেইজিং যাওয়ার কোন বিমান সেদিন ছিল না। সেজন্য এখান থেকে প্রাইভেট কারযোগে লানচু বিমান বন্দরে যেতে হয়। লানচু এখান থেকে প্রায় ছয় ঘন্টার পথ। আমরা এখান থেকে দশটার দিকে যাত্রা করি। বেলা একটা পর্যন্ত সাংহাই প্রদেশের ভিতরেই আমাদের সফর চলতে থাকে। পথের অনেক গ্রামেই মসজিদ দেখতে পাই। প্রায় একটার সময় যোহর নামায পড়ার জন্য যাত্রা বিরতি করতে বলি। মেজবানগণ একটি গ্রামে যাত্রা বিরতি করেন। গ্রামটির নাম শীনাথি। গ্রামটি তাইথুন নদীর নিকটে সাংহাই ও কাংসুর মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত। এখানে সড়কের পাশেই একটি মসজিদ আছে। মসজিদে

নামায শেষ হয়ে গেছে। মসজিদ বন্ধ। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ গ্রামের ভিতরে গিয়ে ইমাম সাহেবের বাড়ী খুঁজে বের করে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসে। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তিনি দ্রুত গরম পানির ব্যবস্থা করেন। আমরা উযূ করে নামায পড়ি। দুপুরের খাবারের জন্য আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ বক্স ছিল। ইমাম সাহেব পীড়াপীড়ি করে তাঁর বাড়ী থেকেও খাবার নিয়ে আসেন। মসজিদ সংলগ্ন একটি কক্ষে আমরা খাবার খাই। সেই কক্ষে চীনের গ্রামাঞ্চলের নিয়মানুযায়ী একটি খাট রাখা ছিল। তার নীচে গরমদানী জ্বেলে রাখায় খাটটি বেশ গরম ছিল। ঐ খাটে বসে নিঃসঙ্কোচে ও আরামে দুপুরের খাবার খাই।

আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদের আগমন সংবাদ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। মসজিদের দরজায় শত শত মানুষ জমা হয়ে যায়। আমরা বের হতেই তারা উচ্চস্বরে আসসালামু আলাইকুম বলে ওঠেন। এরপর মুসাফাহা চলতে থাকে। গাড়ীর নিকট পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যায়।

আরো তিন ঘন্টার পথ চলতে হবে। ইতিপূর্বের সম্পূর্ণ সফর হয় কানচু প্রদেশের ভিতর দিয়ে। ঠিক পাঁচটার সময় আমরা লানচু বিমানবন্দরে পৌঁছি। এখানে কানচু প্রদেশের মেজবানগণের বিরাট সমাবেশ ছিল। তারা এয়াপরোন পর্যন্ত বিদায় জানানোর জন্য পাস নিয়েছিল। এদের সকলেই এক এক করে আমার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। কয়েকজন আলেমের চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। এয়াপরোনে তখন প্রচণ্ড তুষার বায়ুর ঝাপটা চলছিল। কিন্তু বিমান ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। খোদাপ্রদত্ত নিখাদ এই ভালবাসার গভীর স্বাক্ষর হৃদয়ে বহন করে সন্ধ্যা ছয়টায় আমরা বেইজিং এর পথে যাত্রা করি। পৌনে আটটার কাছাকাছি আমরা বেইজিং বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এ সময় বেইজিংএর তাপমাত্রা হিমাংক থেকে ৬ সেলসিয়াস কম ছিল। সাইবেরিয়ার তুষার বায়ুতে তখন পুরা শহর কম্পমান ছিল।

পরের দিন আমাদের চীনে অবস্থানের শেষ দিন। সকালবেলা বিশেষ কোন প্রোগ্রাম না থাকায় আমরা বাজারে যাই। বেইজিং হোটেলের

নিকটেই জাঁকজমকপূর্ণ এই বাজার। সুদূর বিস্তৃত কয়েক তলা বিশিষ্ট ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর। প্রত্যেক ষ্টোরে গ্রাহকের এত ভীড় যে, কাঁধে কাঁধে বাড়ী খাচ্ছিল। সব জায়গায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত। দামাদামীর কোন প্রশ্ন নেই। বেশির ভাগই চীনা শিল্পজাত দ্রব্য। জাপান ও হংকং এর তৈরী কিছু কিছু সামগ্রীও বিক্রি হচ্ছিল।

চায়না মুসলিম এসোসিয়েশন সিং কিয়াং এর অধিবাসীদের একটি রেস্তোরাঁয় বিদায়ী মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করে। মেজবানগণ বলেন ঃ আপনারা সিং কিয়াং যেতে পারলেন না, কমপক্ষে সিং কিয়াং এর লোকদের রেস্তোরাঁতে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে যান। রেস্তোঁরার লোকেরা অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে খাবার খাওয়ান। তাদের খাবারগুলো পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের খাদ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক সপ্তাহ পর খাবারের মধ্যে পাকিস্তানী খাদ্যের স্বাদ গন্ধ দেখতে পাই। এখান থেকে অবস্থান স্থলে ফিরে গিয়ে সাথে সাথেই দেশে ফেরার জন্য বিমান বন্দর অভিমুখে যাত্রা করি।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

আমাদের মেজবানগণ যথার্থই বলেছিলেন যে, চীনের মত একটি দেশ দেখার জন্য নয় দিনের সময় মোটেই যথেষ্ট নয়। আমাদের ভ্রমণের সময় এর বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করি। এতদসত্ত্বেও নয়দিনের এই ঝটিকা সফর অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ, জ্ঞানবর্ধক ও ফলপ্রসূ ছিল।

এই ভ্রমণে প্রথমতঃ, চীনের মুসলমানদের সম্পর্কে এমন সব তথ্য অবগত হই, যেগুলো দূরে বসে জানা দুস্কর ছিল। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পর থেকে চীন একটি আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চীন অল্প দিনেই আন্তর্জাতিক ময়দানে উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করার দৃষ্টিকোণ থেকে এই দেশের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা অধ্যয়নের সুযোগ ঘটে। তৃতীয়ত, এই দেশ সমাজতন্ত্র বরং কমিউনিজমের দ্বিতীয় বৃহত্তম সূতিকাগার ছিল। ফলে কমিউনিজমের অভিজ্ঞতার ফলাফল সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ হয়। সর্বশেষে এই তিন বিষয়েই আমার মোটামুটি অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

চীনে সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে চীন ভিনদেশী শক্তিসমূহের নগ্ন থাবায় গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা ও নৈরাজ্যের শিকার ছিল। যদিও সম্পূর্ণ চীনে ভিনদেশী শক্তির আধিপত্য বিস্তার হয়নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাকে এমনভাবে নিজেদের প্রভাবাধীনে নিয়ে আসে যে, বাস্তবে তা তাদের একটি কলোনীতে পরিণত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে মাও সে তুং ও তার সহকর্মীরা অবিরাম সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটায় এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমানের 'গণপ্রজাতন্ত্রী' চীন প্রতিষ্ঠা করে।

মাও সে তুং কট্টর কমিউনিষ্ট মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষক এবং মার্কস ইজমের এমন ধ্বজাধারী ছিলো যে, সে তার 'লাল পুস্তক' এ রাশিয়ার খরশ্চিফকে 'রক্ষণশীল' ও বুর্জোয়া শক্তির বড় দালালরূপে চিহ্নিত করেন। যেন মাও সে তুং এর ধারণায় রাশিয়া মার্কস ইজমের পথে সঠিকভাবে চলেনি, বরং চীনই মার্কস এর চিন্তাধারাকে যথার্থরূপে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। সুতরাং মাও সে তুং ক্ষমতায় আসার পর আমৃত্যু (১৯৭৮) দেশে নিখাদ সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে কথার ও কাজের কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনি। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার-প্রসার ও চিন্তা-চেতনা গড়া থেকে শুরু করে জোর-জবরদস্তি পর্যন্ত হেন প্রচেষ্টা নেই, যা মাও সে তুং ও তার সমমনা সঙ্গী-সাথীরা চীনে প্রয়োগ করেনি।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পর ক্রমান্বয়ে সমাজতান্ত্রিক দর্শন মোতাবেক দেশের উৎপাদনের যাবতীয় মাধ্যম সরকারী তহবিলে নিয়ে নেওয়া হয়। কয়েকবার বিভিন্ন আঙ্গিকে 'কৃষি সংস্কার কর্মসূচী' বাস্তবায়ন করা হয়। পরিশেষে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে সারাদেশে 'কমিউন সিষ্টেম' চালু করা হয়। যার প্রেক্ষিতে কোন ভূমি কারো ব্যক্তি মালিকানায় আর অবশিষ্ট থাকে না। ছোট ছোট গৃহস্থের নিকট যেসব ছোট ছোট ভূমি অবশিষ্ট ছিল তাও বাজেয়াপ্ত করে 'কমিউন' কে দিয়ে দেওয়া হয়। কৃষকরা তখন একজন শ্রমিকের পর্যায়ে চলে আসে।

গ্রামীণ জনবসতিকে বিভিন্ন 'কমিউন'এ বন্টন করে সম্মিলিতভাবে চাষাবাদ করতে বাধ্য করা হয়। সমন্বিত কৃষি খামার থেকে যেসব শস্য

উৎপন্ন হত, তার কিছু অংশ সরকারের ঘরে যেত, আর অবশিষ্ট উৎপাদিত শস্যের আশি শতাংশ কমিউনের মালিকানা হত। সেগুলো থেকে কিছু এলাকার উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হত। আর কিছু কমিউনের সদস্যদের মধ্যে পারিশ্রমিক হিসেবে বন্টন করা হত। অবশিষ্ট বিশ শতাংশ শ্রমিকদেরকে তাদের কাজ অনুপাতে দেওয়া হত।

এমনিভাবে যাবতীয় শিল্প কারখানাও সরকারের মালিকাধীন করা হয়। কারখানার শ্রমিকেরা তাদের শ্রম অনুপাতে বেতনের অধিকারী গণ্য হত। কিন্তু ব্যবসার লাভ সম্পূর্ণটাই চলে যেত সরকারের হাতে।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সে দেশে এই ব্যবস্থাপনাকে সফল করার যাবতীয় চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার এক আবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হয় যে, যাবতীয় উৎপাদন মাধ্যম ও উপকরণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বলা বাহুল্য যে, উচ্চপদস্থ আমলাদের দ্বারাই সরকার পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে আমলাদের মধ্যে দূর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অপরদিকে কমিউন সিষ্টেমের উপরোক্ত পন্থায় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যথাযথ শ্রমের উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে যায়।

তৃতীয়ত, শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যক্তিগত মুনাফা না থাকায় তার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ফলে পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদন হয় না।

চতুর্থত, সকল কৃষককে শুরুতে এই সবুজ বাগান দেখানো হয় যে, দেশের সম্পূর্ণ জমিই তোমাদের মালিকানাধীন হবে। কিন্তু যখন তারা দেখে যে, বাস্তবে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিকানা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। তাদের আমদানী সম্পূর্ণটাই সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং সরকারী চাকুরীজীবীদের হাতে তা দূর্নীতির শিকার হচ্ছে, তখন তাদের মধ্যে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্পৃহাও জাগ্রত হতে থাকে।

এ সকল সমস্যা চীনেও দেখা দেয়। যার সমাধানে প্রথমদিকে জনগণের মধ্যে 'জাতীয় জাগরণ' ও 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' এর প্রাণ সঞ্চারের উপর জোর দেওয়া হয়। যাতে করে এই প্রেরণার মাধ্যমে উপরোক্ত সমস্যাবলী নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষা কেন্দ্র থেকে

আরম্ভ করে ঘর পর্যন্ত 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' প্রতি ভালবাসা এবং তার জন্য একনিষ্ঠতা জন্মানোর লক্ষ্যে জোর প্রচারণার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী প্রভাবের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়। জনসাধারণের জীবন পদ্ধতি সম্পূর্ণটাই এমনভাবে গড়ার চেষ্টা করা হয়, যার মধ্যে সরলতা, অল্পে তুষ্টি ও দেশপ্রেমের প্রসার ঘটবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে ভালবাসা জন্মাবে।

কিন্তু ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উপরোক্ত সকল পন্থা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর সরকার উপলব্ধি করে যে, সে আমলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। অপরদিকে উৎপাদনেও প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না এবং এতদুভয়ের আবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে জনসাধারণের মধ্যেও এই নতুন ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি হতে চলেছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

সুতরাং ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে মাও সে তুং, লিং পিয়াও ও তাদের মত অন্যান্য কট্টরপন্থীরা গভীর এক অপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই গভীর অপারেশনের নাম ছিল 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'। আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ। তবে তার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল, পুরাতন 'আমলাতন্ত্র' থেকে মুক্তিলাভ করে এমন নেতৃত্বের উত্থান ঘটানো, যা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল ও সমাজতন্ত্রের রঙ্গে রঙ্গিন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে আরেকবার বিপ্লবী প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা চালানো হয়। ছাত্রদের রেড গার্ডস বানিয়ে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন থেকে রক্ষণশীল ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সহযোগীদেরকে বাইরে নিক্ষেপ করার জন্য জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' চারটি পুরাতন বস্তু যথা পুরাতন চিন্তা–চেতনা, পুরাতন সংস্কৃতি, পুরাতন রীতিনীতি ও পুরাতন অভ্যাস[১] এর বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্যযুদ্ধ বলে শ্লোগান দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে

টীকা–১ ঃ চার পুরাতন বস্তুর বিপক্ষে এই কর্মসূচী ১৯৬৬ ঈসায়ীতে কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির একাদশতম অধিবেশনে গৃহীত হয়।

সবাইকেই অংশগ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। সাধারণ মানুষের সামনে এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী এই ছিল যে, "পুরাতন যা পাও পাঠিয়ে দাও।"

এই আন্দোলন আরম্ভ হলে সারা দেশ অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা ও নৈরাজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রামে গ্রামে স্থানীয় প্রশাসন থেকে পুরাতন সদস্যদেরকে বের করে দেয়ার আন্দোলন চলতে থাকে। তখন তারাও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। তাদের এই প্রতিরোধ অনেক জায়গায় ভয়ানক সংঘাতের রূপ ধারণ করে। আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আন্দোলনকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ব্যক্তিগত শত্রুদের বিপক্ষে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করতে থাকে। 'রেড গার্ডস' যাকে ইচ্ছা রক্ষণশীল, বিপ্লবের শত্রু ও সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরূপে চিহ্নিত করে তার বাড়ীতে আক্রমণ করতে থাকে। তার সম্পদ লুট করতে থাকে। তাকে ও তার পরিবারের লোকদেরকে কারাগারে আটক করে অমানবিক অত্যাচারের নিশানা বানাতে থাকে। সে সময়েই সকল প্রকার ধর্মীয় তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়কে বন্ধ করেই ক্ষান্ত করা হয়নি, বরং এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়ারও প্রচেষ্টা চালানো হয়। বাড়ীতে ধর্মীয় কিতাব রাখা অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। যে সকল লোক খানা তল্লাশীর ব্যাপক ক্ষমতা নিয়ে বাড়ী বাড়ী চক্কর দিচ্ছিল, তারা কোন বাড়ীতে যদি একটি মাত্র কুরআন শরীফ আছে বলে সন্ধান পেত, তাহলে অনেক সময় শাস্তিস্বরূপ পুরা পরিবারটিকে ধ্বংস করে দিত। মোটকথা, হত্যা, লুটতরাজ, নিরাপত্তাহীনতা, গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার এক সয়লাব সমগ্র দেশকে তার আবর্তে নিয়ে নেয়। অধিকাংশ শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এমনকি পানাহারের বস্তুর স্বল্পতাও জটিল রূপ ধারণ করে। বাজার থেকে এক পোয়া গোশত খরিদ করতেও সরকারী কুপন প্রয়োজন হয় এবং এই কুপন সংগ্রহ করে লম্বা লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে থেকে তবে এক পোয়া গোশত পাওয়া যেত।

পার্টির লিডারদের মধ্যে তুলনামূলক মধ্যপন্থী একটি দল, এ সকল দূর্নীতির বিরোধী ছিলো। তারা এর মধ্যে দেশের ধ্বংস উপলব্ধি করে

মধ্যপন্থা অবলম্বন করার প্রয়াসী ছিলো। এই দলে লিউ শাউ চী, ডিং জিয়াং পাং ও চুইং লাউ প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু মাও সে তুং সে সময় বয়োবৃদ্ধির কারণে অনেকটা অকেজো হয়ে যান এবং তার সিদ্ধান্তের উপর সেই কট্টরপন্থী দল আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের মধ্যে স্বয়ং তার স্ত্রী জিয়াং চাং, তার ডান হাত লীন পিয়াও[১] এবং এতদুভয়ের সঙ্গী সাথীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারা মধ্যপন্থী দলটিকেও বিপ্লবের শত্রুরূপে চিহ্নিত করে ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য বানায়। লিউ সাউ চীকে হত্যা করে। ডিং জিয়াং পাং ও তার সঙ্গীদেরকে কারাগারে বন্দীত্বের কষ্ট সইতে হয়। চুইং লাউ এর বিপক্ষে নানারকমের ষড়যন্ত্র করা হয় এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শত শত মানুষের উপর অমানবিক নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হয়।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী চুইং লাউ মৃত্যুবরণ করলে সেই দল ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বাস্তবায়নের আরো সুযোগ পায়। কিন্তু ইতিমধ্যে জনসাধারণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধ্বংসযজ্ঞে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সুতরাং পরবর্তী বছর ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আন ঝানি চুইং লাউ এর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের জন্য বেইজিং এর পিপলস স্কোয়ার (থিয়ান আন মান) এবং আরো কিছু শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। তারা জনতার পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত চার কুচক্রীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে।

টীকা ঃ ১. মাও সে তুং এর সঙ্গে লীন পিয়াও এর অবস্থান এমনই ছিল, যেমন ছিল কাল মার্কস এর সঙ্গে ফ্রেরিড্রাক এঞ্জেলস এর। মাও সে তুং এর লাল পুস্তকের ভূমিকাও লীন পিয়াও লিখে দেন। তাকে দ্বিতীয় মাও সে তুং ও মনে করা হত। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা অভাবনীয় ও বিস্ময়কর। কারণ, সভ্যতা বিপ্লবের এই টানা–হেঁচড়ার মধ্যে এমন একটি সময়ও আসে, যখন লীন পিয়াও মাও সে তুং এর গদি উল্টিয়ে দেয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। সে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ঘটনাচক্রে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চু ইং লাউ এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারেন। তখন লীন পিয়াও স্বপরিবারে একটি জাহাজে সওয়ার হয়ে গোপনে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার অন্তর্ধানের বিষয়টি একটি অনুদঘাটিত রহস্য হয়ে থাকে। পরবর্তীতে জানা যায় যে, সে যেই জাহাজে সওয়ার হয়ে যাত্রা করেছিল, তা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পতিত হয় এবং তার ধ্বংসাবশেষ মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায়।

কট্টরপন্থীরা একে নিজেদের জন্য বিপদ ঘন্টা মনে করে জনতার এই সমাবেশের বিপক্ষে কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করে। পত্র–পত্রিকার মাধ্যমে তাদের বিপক্ষে ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়, কিন্তু জনসাধারণের অস্থিরতা চূড়ান্তে পৌঁছেছিল। ১৯৭৬ এর আগষ্টে মাও সে তুং মৃত্যুবরণ করলে হাওয়া কু ফাং কে তার স্থলাভিষিক্ত চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। হাওয়া কু ফাং মধ্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং কথিত আছে যে, মাও সে তুং তার পরবর্তীকালে তাকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ইঙ্গিত করে যায়। তবে মধ্যপন্থী দল তার দ্বারা ধীরে ধীরে কট্টরপন্থীদের পরিপন্থী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়। ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শেষ হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উন্মত্ততা মাথা থেকে নেমে গেলে দলের নেতারা তার ফলাফলের উপর পুনঃর্দৃষ্টি ফেলে চতুর্দিকে বিস্তৃত ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পায় না। তাছাড়া জনসাধারণ আগে থেকেই এই শাসনকালের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে মধ্যপন্থীদল ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সংশোধনের নীতি গ্রহণ করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সুতরাং ১৯৭৮ এর ডিসেম্বরে কমিউনিষ্ট পার্টির একাদশতম কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে খোলাখুলিভাবে এ কথা স্বীকার করা হয় যে, মাও সে তুং এর অনেক পলিসি দ্বারা চীন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বর্তমানে এর সংশোধন দরকার। এতেই শেষ নয়, বরং সে অধিবেশনে হাওয়া কু ফাংকেও চেয়ারম্যান পদ থেকে হটিয়ে অতিরিক্ত চেয়ারম্যান বানানো হয়। এর কারণ হিসাবে একথা বলা হয় যে, সে তার পলিসিতে মাও সে তুং কে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে।

এ সময় মধ্যপন্থী দল (তার মধ্যে ডিং জিয়াও পাং এর ব্যক্তিত্ব সবার উপরে ছিল) নিজেদের অবস্থান ভালভাবে মজবুত করে নেয়। সুতরাং ১৯৮০ সালের নভেম্বরে কট্টরপন্থী দলের নেতৃস্থানীয় দশ জনের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ আদালতে এক ঐতিহাসিক মোকদ্দমা চালানো হয়। একে চীনের ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা বলা হয়। এ মোকদ্দমার মধ্যে চার কুচক্রী, মাও সে তুং এর বিধবা স্ত্রী জিয়াং চাং ও লিয়াং পিয়াও এর দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে আসামী করা হয়। তাদের সকলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তারা নিজেদের পদ দ্বারা

অবৈধ ফায়দা লুটে খুন, লুটতরাজ, প্রতারণা, চালবাজী ও নির্যাতনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

উচ্চ আদালতের ৩৭ জন জজের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চে এই মোকদ্দমার শোনানী হয়। দশজন বিশিষ্ট উকিল অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। উন্মুক্ত আদালতে দীর্ঘদিন এই মোকদ্দমা চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী আদালত সর্বসম্মতিক্রমে সকল অভিযুক্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। অধিকাংশ অভিযুক্তকে ষোল থেকে বিশ বছর ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তাদেরকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মাও সে তুং এর স্ত্রী জিয়াং চাং কে দুই বছরের অবকাশ সহকারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হয়।

এ মোকদ্দমার ইতিবৃত্ত ইংরেজী ভাষায় বেইজিং এর নিউ ওয়ার্ল্ড প্রেস থেকে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটির নাম 'চীনা ইতিহাসের বৃহত্তম মোকদ্দমা' (A Great Trail in Chinese History)। গ্রন্থটি 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' যুগের ধ্বংসযজ্ঞের একটি প্রামাণ্য চিত্র। অধম বক্ষমান প্রবন্ধের অনেক তথ্য এই গ্রন্থ থেকে নিয়েছি। এই মোকদ্দমার অন্যতম জজ অধ্যাপক ফেইজিয়াউ তাং (Feihsiao Tung) এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেনঃ

"আমাদের সম্মুখস্থ মোকদ্দমাটির রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। বিবাদীদের উপর যেসব অপরাধের দায়-দায়িত্ব আরোপ করা হয়, সভ্যতার বিপ্লবের যুগে এবং তার আড়ালে তারা এ সব অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। এখন তো একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সভ্যতার বিপ্লব চীনের জনসাধারণের জন্য নির্দয় ধ্বংসের রূপে আপতিত হয়েছে এবং এই বিপ্লব চীনের জনসাধারণের ও চীন জাতির মধ্যে যেই ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা থেকে আজও রক্তক্ষরণ হচ্ছে।"

"এই বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার জন্য যে সব উপাদান এই ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল সেগুলোর সঠিক পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। সর্বপ্রথম এর মধ্যে কোন্

বিষয়গুলো রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং কোন্ কাজগুলো আইনের বিরুদ্ধাচরণমূলক অপরাধের আওতায় পড়ে তা স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরতে হবে।"

"সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রাজনৈতিক ভ্রান্তিসমূহ যে মারাত্মক ধরনের ছিল তা আর রহস্যাবৃত নয়। ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদের চেয়ারম্যানরূপেই জিয়াং ইয়াং ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ত্রিশতম বর্ষপূর্তির সময় বলেছিলেন যে, 'যে সময় সভ্যতার বিপ্লবের কার্যক্রম শুরু করা হয়, সে সময় দল ও দেশের আভ্যন্তরীণ যে অবস্থা অনুমান করা হয়েছিল তা বাস্তবের পরিপন্থী প্রমাণিত হয়। সে সময় রক্ষণশীলতার স্পষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বরং তখন এই আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য একটি ভ্রান্ত পলিসি ও ভ্রান্তপন্থা অবলম্বন করা হয়, যা গণতন্ত্রের মূলনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুতি ছিল।"

"চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি বর্তমানে সেসব অভিজ্ঞতার সারাংশ উদঘাটনে ব্যাপৃত রয়েছে, যেগুলো ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা অর্জন করেছি। সাথে সাথে এসব অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। তাদের এই কাজে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লাভ ও ক্ষতির বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। আমার ধারণা, এই অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার ফলাফল অতিসত্বর জনসমক্ষে চলে আসবে।"

"সাংস্কৃতিক বিপ্লব যেসব কারণে এত বেশি ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। তার মধ্যে বড় একটি কারণ এও ছিল যে, অপরাধ প্রবণ মানসিকতার অধিকারী একটি দল সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকালে যেই ক্ষমতা পেয়ে যায়, তারা তা দল ও দেশ উভয়ের শীর্ষ ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য ব্যবহার করে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সর্বপ্রকার আইনী–বেআইনী, নৈতিকতা ও নীতি বিবর্জিত পন্থা প্রয়োগ করে। এসব লোক ছিল অপরাধী। এরা এমন সব লোক, যারা ফৌজদারী আইনের খোলামেলা বিরোধিতা করে। এজন্য এরা সেসব ব্যক্তি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন, যাদের থেকে রাজনৈতিক ভুল–ভ্রান্তি সংঘটিত হয়।"

(A Great Trail in Chinese History p. 12)

এই মোকদ্দমা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধ্বংসযজ্ঞকে পূর্ণাঙ্গরূপে জনসমক্ষে তুলে ধরে। যে সব লোক এই মোকদ্দমার বিচারে শুধুমাত্র বিভ্রান্ত নয়, বরং অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে চীনের রাজনৈতিক অঙ্গনের আড়ালে চলে যায়। এতে করে কট্টরপন্থী দল আরো দুর্বল হয়ে পড়ে[১]।

১৯৮২ তে কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। রাজনৈতিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যানের পদ বিলোপ করা হয় এবং তার স্থলে সেক্রেটারী জেনারেলের পদ প্রবর্তন করা হয়। এমনিভাবে পার্টির অবকাঠামোতে ব্যক্তিগত যে প্রভাব বিরাজ করছিল তা খতম করে ধর্মের উপর স্বাধীনভাবে আমল করার তাকীদ করা হয়। তাছাড়া সেই কংগ্রেসেই কু ফাং কে (যাকে মাও সে তুং এর স্থলাভিষিক্ত মনে করা হত এবং যাকে চেয়ারম্যান পদ থেকে পূর্বেই হটানো হয়েছিল।) অতিরিক্ত চেয়ারম্যানের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। আর এভাবেই কট্টরপন্থী দলের সম্ভাব্য প্রভাব অধিক দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া ঐ সময়েই 'মুক্ত দ্বার পলিসি' অবলম্বন করা হয় এবং ভিনদেশীদের আগমনের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাসমূহকে অনেক শিথিল করে দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বড় ধরনের এই বিপ্লব দেখা দেয় যে, গ্রামাঞ্চলে কমিউন সিষ্টেমকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত ৫৪ হাজারের অধিক কমিউন খতম করে দিয়ে সম্মিলিত দায়িত্ব (Collective Responsibility) এর নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ব্যবস্থাপনার অধীনে গ্রামের সকল গোত্রকে তার পরিবারের সদস্য অনুপাতে কৃষি কাজের জন্য জমি দেওয়া হয়। সরকার উৎপাদিত

টীকা ঃ ১. এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, এই মোকদ্দমায় মাও সে তুং এর বিধবা পত্নী জিয়াং চাং ছাড়া অধিকাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তিই তাদের সিংহভাগ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়। তাদের মধ্য থেকে কিছু কিছু লোক অনুশোচনা প্রকাশ করে নিজেদেরকে স্পষ্ট ভাষায় শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত করে। এমনকি তাদের উকিলেরা তাদের অনুশোচনা প্রকাশের ভিত্তিতে শাস্তি লঘু করার দরখাস্ত করা ছাড়া তাদের স্বপক্ষে পৃথক কোন অবস্থান অবলম্বন করতে পারেনি।

শস্যের নির্ধারিত একটি পরিমাণ (জমির পরিমাণের ভিত্তিতে) নির্ধারণ করে দেয় যে, সেই পরিমাণ ফসল সরকারকে প্রদান করতে হবে। অবশিষ্ট উৎপাদিত শস্য কৃষকের মালিকানায় থাকবে। সে তা আপন মর্জিমত বিক্রি করে তা থেকে মুনাফা লাভ করতে পারবে।

এখন সরকার এবং চাষীর সম্পর্ক যেন জমিদার ও কৃষকের অনুরূপ। সরকার জমিদার আর চাষী তার কৃষক। পার্থক্য এই যে, আমাদের বর্গাচাষে উভয় পক্ষের অধিকার উপযুক্ত অংশ (এক-তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক) রূপে নির্ধারিত হয়। আর সেখানে সরকার নিজের অংশকে একটি নির্ধারিত পরিমাণে নির্দিষ্ট করে রেখেছে। (যা ইসলামী ফেকাহর দৃষ্টিতে বর্গাচাষের একটি ভুল পন্থা)।

অপরদিকে শিল্প ও বাণিজ্যে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় যে, এখন সীমিত পরিসরে ব্যক্তিগত পুঁজি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ভিনদেশী পুঁজিপতিদেরকে সে দেশে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য আহবান করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট এক পর্যায় পর্যন্ত ব্যক্তিগত মুনাফার লাভের উদ্যোগকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এ উদ্দেশ্যে বাজারের চাহিদা ও উৎপাদন শক্তিসমূহকেও (Market Forces) গতিশীল করা হচ্ছে।

১৯৮৪ সালের জুন থেকে শিল্প কারখানাতেও কৃষির মত 'সম্মিলিত দায়িত্ব' এর নিয়ম জারি করা হয়। যার মূল কথা ব্রিটানিকা ইয়ার বুক ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ "জুনে সরকারী মালিকানাধীন সকল শিল্প–কারখানাকে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজের লাভ লোকসানের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করা হয়। এখন একটি কারখানাকে তার যাবতীয় মুনাফা সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে সরকারকে তাদের মুনাফার উপর আরোপিত কর প্রদান করতে হবে। অবশিষ্ট মুনাফা শ্রমিকদের বেতন–বোনাস দিতে ও পুঁজি বিনিয়োগের নিয়মে ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো দ্বারা তাদের কারবারের মান অনুপাতে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এমন সকল নতুন অধিকার প্রদান করা হয়েছে যা অতীব গুরুত্ব রাখে।" (Britannica Year Book 1984 'China' P. 235)

বর্তমানে চীনা পলিসির এসব পরিবর্তনকে 'সংস্কার' নাম দেওয়া হয়েছে। 'সংস্কারের' এই ধারা আজও চালু রয়েছে। প্রফেসর ফেইজিয়াও তাং এর ভাষায় এটি ১৯৪৯ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত শিক্ষার ফলাফল। এ সব পলিসি গ্রহণের ফলে উৎপাদন এবং কৃষকদের আমদানী উভয়টিতে অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

এই হলো চীনে সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার ৩৬ বছরের ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত সারকথা। এই সারাংশ থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়—

১. চীন জাতির মধ্যে নিজেদের ভুল স্বীকার করার, তা নিরীক্ষা করার এবং সে মোতাবেক নিজেদের পলিসি পরিবর্তন করার সাহস বিদ্যমান রয়েছে। যা তারা বিগত প্রায় ৯ বছর ধরে করে আসছে।

২. সেই নিরেট সমাজতান্ত্রিক কল্পনাসমূহ, যেগুলোকে ঐতিহ্যগতভাবে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর বলা হত এবং বিশ্বাস করা হত, চীনে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা সফল হয়নি। আর এর ভিত্তিতে চীন এখনও একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও সেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ক্রমান্বয়ে এমন সব সংস্কার করা হচ্ছে, যেগুলো কমিউনিজমের পুরাতন চিন্তাধারা থেকে অনেক ভিন্নতর।

৩. 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শ্রেণীসংগ্রামের এক দৃষ্টান্তমূলক প্রদর্শন। তার পশ্চাতে অত্যন্ত সুদৃঢ় শক্তি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তা চীনকে বেদনাপূর্ণ ক্ষত ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি। বাস্তব এই যে, চীনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ৩৬ বছরের ইতিহাস গবেষণা ও বিশ্লেষণের অত্যন্ত সুস্বাদু আলোচ্য বিষয়। অধমের জানামতে সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত গবেষণার আঙ্গিকে মুসলিম বিশ্বের কেউই কলম ধরেনি। অধমের মতে এর ইতিহাস বিস্তারিত অধ্যয়ন করে তার ফলাফল তথ্যবহুল আঙ্গিকে জনসমক্ষে তুলে ধরা বর্তমান সময়ের তীব্র প্রয়োজন, যাতে করে তা থেকে সমগ্র বিশ্ব উপকৃত হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত এই সফরনামা গবেষণামূলক কোন প্রবন্ধের জন্য উপযোগী নয়। নয় দিনের এই ঝটিকা সফরে অধমের জন্য এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয়

দিক সম্পর্কে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষা করা সম্ভবও ছিল না। তবে একজন সাধারণ পাঠকের জন্য সেখানকার অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরলাম। যা ইনশাআল্লাহ্ লাভজনক হবে এবং এটা এজন্য যে, যদি এই সংক্ষিপ্ত চিত্র কোন সাহসী গবেষকের অন্তরে এই বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করতে পারে, তাহলে এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ বিরাট বড় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছে বলে আমি মনে করব। আর তা আল্লাহর জন্য কঠিন কিছু নয়।

সাধারণ জীবন যাপন পদ্ধতি

এ তো ছিল চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। কিন্তু চীনের জনসাধারণের মধ্যে এমন কিছু গুণ দৃষ্টিগোচর হয়, যা নিঃসন্দেহে ঈর্ষার যোগ্য। আর সম্ভবত এসব গুণ থাকার কারণেই দেশটি আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা সওয়ার হওয়ার পরও উন্নতির পথে অবিচল রয়েছে।

তার মধ্যে প্রথম গুণটি হল, চীন জাতির সাদামাটা জীবনধারা। চীনের যেখানেই আমি গিয়েছি, সেখানেই এ বিষয়টি স্পষ্ট অনুভব করেছি যে, সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের আসল মনোযোগ রয়েছে স্থায়ী ও উন্নতিমূলক কাজের দিকে। লৌকিকতা ও আড়ম্বর তাদের মধ্যে একেবারেই নেই। শুরুতে আমি লিখেছি যে, বেইজিং এর মত প্রধান শহরেও রাত্রিবেলায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থাই করা হয়েছে। পুরো শহরে কোথাও কোন আলোকসজ্জা অধমের চোখে পড়েনি। তাছাড়া প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনের সেই তুফান, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাবাধীন দেশসমূহে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যের রূপ লাভ করেছে, এখানে তারও অস্তিত্ব নেই। সড়কের উপর দুই একটা বিজ্ঞপ্তি–সাইনবোর্ড চোখে পড়ে, কিন্তু তাতেও সরলতার দিক ভাস্বর। বেইজিং যথেষ্ট পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন একটি শহর। সড়কগুলো বেশ চওড়া হওয়ার কারণে মনেই হয় না যে, এটি এক কোটি লোকের বসতপূর্ণ একটি মেগাসিটি। প্রাসাদ ধরনের ভবন এবং বাংলো জাতীয় বাসস্থান খুব কম। বেশির ভাগই মধ্যম ধরনের ফ্লাট বাড়ী। জীর্ণ শীর্ণ বাড়ীর সংখ্যাও অনেক বেশি।

মানুষের পোশাকও সাধারণ–সাদামাটা এবং প্রায় সকলেরই এক ধরনের পোশাক। বিশেষ করে কাংসু ও সাংহাই প্রদেশে জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান অনুভূত হয়নি। সরকারী অফিসারগণ জনসাধারণের সাথে মিলে মিশে থাকে। লিংসার কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার দুদিন ধরে অনবরত আমাদের সাথে ছিলেন। তাদের কোটের একাংশে ময়লা লেগেছিল। তাদেরকে জনসাধারণের সাথে অকৃত্রিমভাবে মিশতে দেখেছি। কাংসু প্রদেশের ডেপুটি গভর্নরকেও বেশভূষা ও আচার–আচরণে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়েছে। তার মধ্যে আড়ম্বরের কোন কিছু দেখতে পাইনি। একজন সাধারণ চাকুরীজীবি ও উচ্চপদস্থ অফিসারের বেতনের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান নেই।

এদিক থেকেও চীন বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম অবস্থানের অধিকারী যে, এক কোটি জনবসতির মহানগরী বেইজিং এর প্রাইভেট কারের সংখ্যা এখনও কয়েক শ'র বেশি হবে না। এক সময় তো প্রাইভেট কার রাখার অনুমতিই ছিল না। এখন অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে শহরে বেশির ভাগ টেক্সিই সরকারী বা ভিনদেশী। চীনাদের প্রাইভেট কারের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ লোক বাসে ও সাইকেলে ভ্রমণ করে থাকে। প্রত্যেকটি সড়কের উভয়দিকে সাইকেলের জন্য পৃথক রাস্তা আছে। সেখানে সর্বদা সাইকেলের এক প্রবাহিত সয়লাব দৃষ্টিগোচর হয়। শহরের জায়গায় জায়গায় সাইকেল রাখার জন্য নির্ধারিত প্লাটফর্ম রয়েছে। দীর্ঘপথ হলে লোকেরা কিছুদূর পর্যন্ত সাইকেলে ভ্রমণ করে, সাইকেল ষ্ট্যাণ্ডে রেখে দিয়ে বাকি পথ বাসে ভ্রমণ করে। জাঁকজমক, লৌকিকতা ও প্রদর্শনী বর্জনের এই সুফল হয়েছে যে, চীনে নগ্নতা ও অশ্লীলতার সেই ভাবধারা দৃষ্টিগোচর হয় না, যা পাশ্চাত্য জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বরং ধীরে ধীরে এখন পশ্চিমা প্রভাবাধীন প্রাচ্যের দেশসমূহেও এই সর্বগ্রাসী ফেতনা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

চীনা জনসাধারণের আরেকটি গুণ পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। শহর হোক আর গ্রাম হোক, লোকজনকে তাদের কাজে ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়।

চীন মোটের উপর একটি দরিদ্র দেশ। তার প্রাকৃতিক সম্পদও জনবসতির অনুপাতে খুব বেশি নয়। এমনকি তার ছিয়ানব্বই লক্ষ বর্গকিলোমিটার ভূমির মাত্র দশ শতাংশ চাষযোগ্য। অবশিষ্টাংশ হয় পাহাড় ও সাগরের নীচে অথবা বৃক্ষ পানিশূন্য মরুভূমি অথবা অন্যান্য ভৌগোলিক সমস্যার কারণে আবাদযোগ্য নয়। তবে চীনের প্রতি হেক্টরের উৎপাদন পাকিস্তানের তুলনায় বেশি। এই আধিক্য কৃষকের পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতারই ফল।

আমরা যখন বেইজিং এ ছিলাম, তখন আমাদের নিকটেই কপি ভরা একটি ট্রাক ঘোরাফেরা করছিল। প্রতিটি গলিতে স্তূপাকারে কপি রাখা ছিল। খরিদ্দাররা সেখানে ভীড় করছিল। একটু পরপরই লোকদেরকে সাইকেল ও স্কুটারে করে প্রচুর পরিমাণ কপি নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, এ সময় কপির ফসল কাটা হচ্ছে। পুরা শীতকালে প্রচণ্ড শীতের কারণে কপি চাষ করা সম্ভব হবে না বিধায় লোকজন সে সময়ের জন্য তা সঞ্চয় করে রাখছে। ঘরের মধ্যে বিশেষ এক পদ্ধতিতে সুড়ঙ্গের মত বানিয়ে তাতে কপি সংরক্ষণ করা হয় এবং পুরো শীতকাল তা ব্যবহার করা হয়।

কাংসু থেকে লিনসা যেতে পথের ছোট ছোট পাহাড়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত ও খননের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, এখানকার উপত্যকার জমি কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। সে জন্য কৃষকেরা পাহাড় খনন করে তা থেকে মাটি বের করে সেই মাটি নিজেদের জমিতে বিছিয়ে দিয়ে তাতে চাষ করে। তাছাড়া ফসল কাটার পর ঐসব গর্ত দ্বারা গোলার কাজও নেওয়া হয়।

কাংসু ও সাংহাইয়ের বেশির ভাগ গ্রাম অত্যন্ত পশ্চাদপদ, বাড়ীঘর জীর্ণশীর্ণ, সড়কসমূহ কাঁচা ও অসমতল। অধিবাসীদের চেহারায় দারিদ্রতার নিদর্শন স্পষ্ট। চেহারা লাল শুভ্র হওয়ার পরও শীতের প্রচণ্ডতার কারণে ঝলসানো ও পাণ্ডুবর্ণ দেখা যাচ্ছিল। তারপরও সকলকেই কষ্ট সহিষ্ণুতার সাথে কাজে লিপ্ত দেখতে পাই। অলসতা ও কর্মবিমুখতার নিদর্শন কোথাও চোখে পড়েনি।

চীনা জনসাধারণের ব্যায়াম করার শখ খুব বেশি। ফজরের পর

বেইজিং এর সড়কে বের হলে জায়গায় জায়গায় মানুষদেরকে সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম করতে দেখা যায়। মনে হয় যেন, এ কাজের জন্য তারা নিয়মিত গ্রুপ বানিয়ে নিয়েছে। তারা অভিজ্ঞ ও দক্ষ একজনের তত্ত্বাবধানে সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম করে থাকে।

সাধারণ জনগণের বেতনের হার অনেক কম। বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বললেন, তিনি মাসিক একশ দশ ইউয়ান বেতন পান। (যা পাকিস্তানের ছয়শ টাকা থেকেও কম) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই টাকায় কি আপনার চলে? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা চাদর দেখে পা বাড়াই (আয় বুঝে ব্যয় করি)। তা নাহলে চাহিদার শেষ নেই। আমি জানতে পারি যে, তিনি সরকার থেকে যে ফ্ল্যাট পেয়েছেন, তার ভাড়া শুধুমাত্র পাঁচ ইউয়ান। কিন্তু তা মাত্র পঞ্চাশ বর্গগজের একটি ফ্ল্যাট। বাসে সফর করার জন্য তারা পাস বই পেয়ে থাকে। চিকিৎসা এবং শিশুদের শিক্ষা বিনা বেতনে হয়ে থাকে। প্রয়োজনের অধিক নতুন নতুন পোশাক বানানোর অভ্যাস নেই। এজন্য বেতনের বেশির ভাগ পানাহারের সামগ্রীর জন্যই ব্যয় হয় এবং এতে করে চলে যায়।

যাই হোক, সরলতা, পরিশ্রম, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও অল্পেতুষ্টির গুণ যে জাতি গ্রহণ করবে তাদের নিশ্চিত উন্নতি করার অধিকার থাকবে। তারা একদিন না একদিন বিশ্ববাসীর নিকট থেকে তাদের সম্মানের স্বীকৃতি আদায় করেই ছাড়বে। এসব গুণ তো মুসলমানদের অবলম্বন করার ছিল এবং যতদিন তা মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, বিশ্বের কোন জাতি তাদের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু যখন থেকে আমরা লৌকিকতা, প্রদর্শনী, অনর্থক ব্যয়, আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার পথ অবলম্বন করেছি, তখন থেকে ইহলৌকিক সম্মান ও উন্নতিও আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন এসব গুণাবলী ধারণ করে চীন অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বের উন্নত জাতির সারিতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে।

চীনের মুসলমানদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, বাহ্যত চীনে মুসলমানদের সংখ্যা কোনভাবেই পাঁচ কোটির কম নয়। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুগে এখানকার মুসলমানগণ অত্যন্ত কঠিন ও ধৈর্য সংকুল সময় অতিক্রম করে। যেসব মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি, তা থেকে জানা যায় যে, বিপ্লবের আগে এখানে দ্বীনী তালিম ও তাবলীগের বড় বড় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেগুলো বিপ্লবের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে বেশির ভাগ মসজিদও বন্ধ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের কোন কপি ঘরে রাখা বিপদকে আমন্ত্রণ জানানোরই নামান্তর ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের বান্দাগণ সেই যুগেও ভূগর্ভস্থ কক্ষে লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্মীয় পুস্তকসমূহ সংরক্ষণ করার চেষ্টা চালায়। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের জন্য সহজ পথ খুলে দেন। এটা শুধুই প্রোপাগাণ্ডা নয়। বাস্তবিকই এখন সেখানে মুসলমানদের অধিকাংশ ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। যে কারণে তাদের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত দেখা যায়। মসজিদসমূহ পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। নতুন নতুন মসজিদও নির্মাণ করা হচ্ছে। মাদ্রাসাসমূহ পুনর্জীবিত হচ্ছে। নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটকথা, এখানকার পরিস্থিতি খুবই আশাব্যঞ্জক।

তবে ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞার যেই কঠিন যুগ তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে, তার প্রভাব যে সেখানে রয়ে গেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে চীনা মুসলমানদের পথ প্রদর্শনের একমাত্র কেন্দ্র মসজিদের ইমামগণ। ইমামদের সেখানে খুব সম্মান করা হয়। কিন্তু ইমামগণ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য নিজেদের দেশের বাইরে কখনো যায়নি। তারা চীনের মাদ্রাসাগুলোতেই শিক্ষা লাভ করেছে, বর্তমানে ইমামদের সিংহভাগই তারা, যারা ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পর কোন না কোনভাবে দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করেছে। তার আবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, দ্বীনের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান খুব সীমিত। এসব ইমামগণ প্রথমত, চীনা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ভালভাবে জানেন না। দ্বিতীয়ত, আরবী ভাষা কিছু জানা থাকলেও আরবী কিতাব সেখানে খুবই দুষ্প্রাপ্য। তারা

নিজেদের সকল কাজ মিশকাত শরীফ, জালালাইন শরীফ, শরহে বেকায়া ও শরহে আকাইদ দ্বারা চালাচ্ছে। অন্যান্য কিতাব বড় বড় শহরের দু' একটি গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে ও গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায় না। আলেমগণ জনসাধারণের জন্য চীনা ভাষায় এমন সহজ সহজ পুস্তিকা রচনা করেছেন, যেগুলো আকাইদ ও ইবাদতের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দিতে পারে। চায়না মুসলিম এসোসিয়েশনও এমন কিছু পুস্তিকা সংকলন করে প্রকাশ করেছে। কিন্তু স্বয়ং ইমাম ও আলেমদের পথ প্রদর্শনমূলক গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এই যে, মসজিদের বেশির ভাগ ইমাম এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁদের স্থান পূরণের জন্য তরুণদের তালিম ও তারবীয়ত জরুরী। আলহামদুলিল্লাহ! বেইজিং, লানচু ও শীনং প্রভৃতি জায়গায় পাঁচ বছর মেয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু তা সারা দেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সাহায্য ও দক্ষ ওস্তাদ উভয়টিরই প্রয়োজন রয়েছে।

তৃতীয় সমস্যা, শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক। আমি জানতে পারি যে, দেশে এখনও এই আইন বলবৎ রয়েছে যে, আঠারো বছর থেকে কম বয়সের কাউকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। যদিও এই আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে বর্তমান সরকার কিছুটা নরম ও শিথিল পলিসি অবলম্বন করেছে এবং এই ব্যাপারে খুব বেশি ধরপাকড় হয় না। সুতরাং কোন কোন জায়গায় শিশুরা মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করছে। কিন্তু জানা কথা যে, যতদিন এ আইন বলবৎ থাকবে, ততদিন মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ্যে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে না। সুতরাং শিশুদেরকে পবিত্র কুরআন ও নামায ইত্যাদির শিক্ষা বেশির ভাগ সময় ঘরের মধ্যেই দেওয়া হয়। আর এটা পরিষ্কার যে, মা বাবার অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততা তাদেরকে এতটুকু সুযোগ দেয় না, যা শিশুদের জন্য মক্তবের অভাব পূরণ করতে পারে।

এসব সমস্যার সাথে সাথে এ দুটি বিষয়ও মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানগণ দীর্ঘদিনের কষ্টের পর বর্তমানের ধর্মীয় স্বাধীনতা পেয়েছে, তাই আবেগতাড়িত হয়ে এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হবে না, যা

স্বাধীনতার স্বপক্ষের পলিসির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিধায় তাদের সুকৌশলে এবং অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থাতে যেহেতু সরকার ধীরে ধীরে ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে মুক্ত পলিসি গ্রহণ করছে, তাই সেসব মুসলমানের জন্য প্রেরিত মুসলিম বিশ্বের যে কোন সহযোগিতা সে দেশের সরকারের মাধ্যমে অথবা চায়না মুসলিম এসোসিয়েশনের মাধ্যমে হওয়া উচিত।

আমরা আমাদের এই সফরে চীনা সরকারের নিকট প্রস্তাব করি যে, তারা মুসলমান ছাত্রদেরকে পাকিস্তান পাঠালে তাদের থাকা খাওয়া সহ উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করাকে আমরা আমাদের সৌভাগ্য মনে করব। সাথে সাথে পাকিস্তান থেকে সীমিত সময়ের জন্য পরিদর্শক হিসেবে শিক্ষকদের একটি দলও সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা যেতে পারে। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ এসব প্রস্তাবকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে বাস্তবভিত্তিক বিস্তারিত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওয়াদা করেছেন।

সাধারণ মুসলমানদের সর্বপ্রথম করণীয়, তাদের চীনা ভাইদের জন্য সবসময় কল্যাণের দুআ করা, যেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান সংরক্ষণের তাওফীক দান করেন এবং এই আমানতকে ভবিষ্যত প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ দান করেন। আমীন।

দ্বিতীয়ত সেখানকার আলেমদের তাফসীর, হাদীস ও ফেকাহর আরবী গ্রন্থসমূহের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোন সুহৃদ ব্যক্তি তাদের জন্য এসব কিতাব পাঠাতে প্রস্তুত হন, তাহলে কিতাব নির্বাচন করা এবং সেখানে পাঠানোর পদ্ধতির বিষয়ে অধমের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

২০শে রবিউল আউয়াল
১৪০৬ হিজরী

॥ ॥ ॥

পরবর্তী আকর্ষণ

অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক

(জাহানে দিদাহ্‌র বঙ্গানুবাদ চতুর্থ খণ্ড)

এ অংশে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।